

রাজনন্দিনী

সোমক দাস

জ্ঞান-ভবন
১৮সি টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশনা—আগষ্ট ১৯৫৬

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী প্রমীলা বাগচী
দুর্গানগর, মাদ্রাস
২৪ পরগণা

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৬৬, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

ত্রিপুরার গৌরব
মহারাজকুমারী কমলপ্রভা দেবী

ক্ষমা করো, তোমার শৈল্পিক-সত্তাকে
প্রকাশ করার মতো প্রতিভা আমার নেই।

পূর্বকথা

ত্রিপুরার রাজ-অন্তঃপুরেব খবরাখবব বাইরের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, তবু অসম্ভবকে সম্ভব করতে কোনো লেখক যখন ইতিহাসকে বিকৃত করেন—বাস্তবিক সাহিত্যের অমর্যাদা করা হয়। সাহিত্যকে রন্ধনশালায় পরিণত করা সৎ-সাহিত্যিকের এক্তিয়ারে পড়ে না। ত্রিপুরার চার পুরুষের মহারাজাদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও 'বিসর্জন' এবং 'রাজর্ষি' লেখার প্রাক্কালে দফায় দফায় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে পত্র লিখে এবং ত্রিপুরার 'রাজমালা' আত্মস্থ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যধর্মের পূজারী মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের চরিত্রকে ঐতিহাসিক রূপ দিয়েছেন। এত কান্ড করতে হয়েছিল, কারণ সাহিত্যে ভণ্ডামি তিনি বিশ্বাস করতেন না।

সাহিত্য মশলাপাতির কারবার নয়, জীবনের অভিজ্ঞতায় যা ধরা দেয় নি, সে বিষয় নিয়ে লেখালিখি করে পাঠকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা সৎ-সাহিত্যের ধর্ম নয়। জীবনমুখি সাহিত্যের বাইরে নকল মনোহারি দোকান সাজালে সৎ-পাঠকদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয়। সাহিত্যে সততা অপরিহার্য।

রাজপরিবারে জন্মসূত্রে জেনেছি রাজকুমার-রাজকন্যাদের জীবনচর্যার কথা। রাজকুমার-রাজকন্যাদের নিয়ে অনেক রূপকথা আছে, রাক্ষসের গল্প আছে, সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি আছে, কিন্তু সত্যিকারের রাজকন্যাকে নিয়ে কোন বিশেষ রাজ্যের প্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যে অদ্যাবধি কোনো উপন্যাস লেখা হয়নি, অন্তত আমার জানা নেই।

রাজনন্দিনী—ব্যতিক্রমী উপন্যাস। নিজস্ব অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসের মূল উপাদান। পুতুলখেলার স্মৃতি, স্ব-রচিত কবিতা, বিভিন্ন বিষয়প্রেক্ষিত গদ্য এবং ভ্রমণ কাহিনীতে গভীর জীবনদর্শন ও বোধের অনুপম স্পর্শ থাকা সত্ত্বেও মহারাজকুমারী কমলপ্রভা দেবীর 'খেলাঘর' কোনো সংজ্ঞাতেই জীবনী নয়, যদিও মেঘের কোলে সূর্যের কিরণের মতো উঁকি দিয়েছে জীবনের ইঙ্গিতবাহী খণ্ড-বিখণ্ড চিত্র। এই ইঙ্গিতবাহী চিত্রদলকে উপন্যাসের প্রয়োজনে বাস্তবোচিত চিন্তায় ও কল্পনায় বিস্তারিত রূপ দেওয়া হয়েছে। তাঁর রচিত 'খেলাঘর' থেকে অনেক উদ্ধৃতি আছে নতুবা উপন্যাসটির বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ

হতো না। কলাবতীর শৈল্পিকসত্তার রূপায়ণই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। স্বাভাবিক ভাবেই ত্রিপুরার শেষ মহারাজার তৎকালীন ইতিহাস অকপটে ধরা দিয়েছে। এটি একটি নিছক উপন্যাস, কোনো মহারাজকুমারীর পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনেতিহাস নয়। কলাবতী এবং কমলপ্রভা দেবীর মধ্যে একটিই সাদৃশ্য— শৈল্পিক-সত্তা। জীবন নয়।

এবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

মহারাজকুমারী কমলপ্রভা দেবীর 'খেলাঘর' পড়ার পর আমার মনে হল এই রাজকন্যাকে স্বপ্ন-বাস্তবতায় রূপ দেওয়া যায়। তাই রাজন্য-শাসিত ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। মহারাজকুমারী কমলপ্রভা দেবী তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী নিয়ে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিলেন— এটাই মস্ত বড়ো কথা। এই মহান ব্যক্তিত্বকে রূপ দিতে পেরেছি কি না জানি না, তবে চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না। ইতিহাসকে বাস্তব রূপ দিতে নায়ক-নায়িকা ছাড়া অন্যান্য চরিত্রদের আসল নাম পরিবর্তন করা হয়নি।

মহারাজকুমারী কমলপ্রভা দেবী এক অনন্য চরিত্র, কৃতজ্ঞতার উর্দ্ধে তাঁর স্থান।

বন্ধুবর শ্রী অতীন্দ্রিয় পাঠকের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এই উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়েছে। অনেক ভুল যা লেখকের চোখে ধরা পড়ে না, সে-ই ভুল সংশোধনের দায়ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। বন্ধুকে আন্তরিক সহযোগিতার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করতে নেই।

তথ্য সংগ্রহে নিম্নলিখিত বইগুলো আমাকে অসীম সাহায্য করেছে—

রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা — বিকচ চৌধুরী

মাণিক্য শাসনাধীন ত্রিপুরা — ডঃ নলিনী রঞ্জন রায় চৌধুরী

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ত্রিপুরার সমাজ ও রাজনৈতিক চিত্র — রমাপ্রসাদ দত্ত

বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরা (প্রথম খণ্ড) — দীনেশ চন্দ্র সাহা।

উপরোক্ত লেখকদের ঋণ অনস্বীকার্য।

শারদীয় 'প্রান্তিক সাহিত্যপত্রে' প্রকাশিত 'রাজনন্দিনী' উপন্যাসটিকে সামান্য পরিবর্ধিত আকার দেওয়া হয়েছে।

রাজনন্দিনী



উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের চূড়ায় কালো গাভীর মতো মেঘেরা চরে বেড়াচ্ছে। ঝড় আসন্ন-প্রায়। চতুর্দিক অন্ধকার, থমথমে, নিশ্চুপ। হাওয়ার দম আপাতবন্ধ। নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। ঘুরন্ত পাখার আওয়াজ গম্বুজে ধাক্কা খেয়ে আর্তনাদ করে উঠছে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের বিউগল রাজকীয় সঙ্গীত বাজিয়ে থেমে গেলো। এখন শ্বেতকপিধ্বজ সিংহলাঞ্ছিত রাজপতাকা অবনমিত হবে। সন্ধে হয় হয়। রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলের এই সভাঘরে এখন কারো প্রবেশ নিষেধ। দুয়ারে বল্লম উঁচিয়ে দুজন রক্ষী পাহারা দিচ্ছে। সভাঘরে আছেন স্বয়ং মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য, তাঁর বিমাতা চতুর্থ মাতামহারানী জীবনকুমারী দেবী, আছেন খুল্লতাত ব্রজেন্দ্রকিশোর ও তাঁর পুত্র নক্ষত্রকিশোর। এককোণে উদ্বিগ্নমুখে মাথা নিচু করে বসে আছেন বিদেহী মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের কন্যা বীরবিক্রমের বৈমাত্রেয় সহোদরা মহারাজকুমারী কলাবতী। বিচারপর্বের সুরু হবে কিন্তু কারো মুখে কথা নেই। প্রথম কথাবলার রীতি মহারাজের, তারই অপেক্ষায় সময় কাটছে।

গম্ভীরমুখে মাতামহারানীর দিকে তাকিয়ে বললেন বীরবিক্রম, মাইদেবতা, সভার কাজ শুরু করা যাক।

সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

বীরবিক্রম বিনীতভাবে বলতে লাগলেন, মাইদেবতা, কাকাকর্তা, রাজপরিবারের মানসম্মান বজায় রাখার সময় এসেছে। মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর বেঁচে থাকলে এর প্রতিবিধান করতেন। কিছুতেই তাঁর কন্যা রাজকুমারী কলাবতীর সঙ্গে কাকা কর্তার পুত্র নক্ষত্রকিশোরের বিয়েতে সম্মতি দিতেন না। ভাইবোন বিয়ে করলে প্রজারা আড়ালে ছি ছি করবে। তাদের সামনে এমন অসামাজিক দৃষ্টান্ত রাখলে রাজ্যে অনাচার বৃদ্ধি পাবে। প্রজার মঙ্গলই যদি রাজকর্তব্য হয় তাহলে আপনারা আমাকে উপদেশ দিন, মহারাজা হিসেবে এ ক্ষেত্রে আমার কী কর্তব্য?

ব্রজেন্দ্রকিশোর, পরিচিত নাম লালু কর্তা অসহায়ের মতো বললেন, বাবা মহারাজের বিবেচনা ঠিক। এ অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। তবে মহারাজের সম্মতি

পেলে আমি নক্ষত্র এবং কলাবতীকে কয়েকটা প্রশ্ন করার ইচ্ছে রাখি।

মহারাজ সম্মতি দিলেন।

লালু কর্তা নক্ষত্রকে প্রশ্ন করলেন, তোমার তো অনেক সেবাদাসী আছে, তবু কেন রাজকুমারী কলাবতীকে বিয়ে করতে চাইছো? কারণ জানতে ইচ্ছা করি।

উত্তরটা যেন বাবাকে নয় মহারাজকে দেওয়া হচ্ছে এমন একটা ভাব করে নক্ষত্র কর্তা বলতে লাগলেন, দাদা মহারাজ, আমরা একটা বদ্ধগণ্ডীতে বাস করি। বাইরের উন্মুক্ত আকাশ আমাদের জন্যে নয়। উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের বাইরের জগৎকে রানী বা রাজকুমারীরা দেখতেও পান না। তাঁরা রাজ-অন্তঃপুরে বারোমাসে তের পার্বণ করেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, শিল্পাদির মাধ্যমে সময় কাটান। রাজকুমাররা ছোট থাকতেই কেউ কুমিল্লায়, ঢাকায়, কার্সিয়াং বা দার্জিলিং-এ চলে যান। রাজকুমার - কুমারীরা জন্ম থেকে পিতামাতারই সঙ্গবর্জিত, ভাইদের কথা তো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। বয়ঃসন্ধিকালে মেলামেশার অভাবে যখন রক্তসম্পর্কিত বোনের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করি, সম্পর্কটা মিথ্যে মনে হয়। রূপ-যৌবন মনের মধ্যে খেলা করে। আমাদের চেয়েও হতভাগী রাজকুমারীরা, যাঁরা অনাত্মীয় পুরুষের গায়ের গন্ধ পায়নি কোনদিন, যৌবনের আকুল আবেদন তাঁদের সম্পর্কের কথা ভুলিয়ে দেয়। কলাবতীকে আমি কখনো ভাইয়ের চোখে দেখি নি। ওঁকে ভালোবেসে যদি বিয়ে করতে চাই তো সম্মানই জানানো হয়। রাজকুমারীকে তো আর সেবাদাসীর মর্যাদা দিতে পারি না?

সব শুনে মহারাজ বীরবিক্রম বললেন, এবার রাজকুমারী কলাবতীর বক্তব্য শোনা যাক।

কলাবতী মাথা নিচু করে ছিলেন। এবার মুখ তুললেন। এত সুন্দর মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। সংযত স্বরে বললেন, দাদা মহারাজ জানেন, নক্ষত্র কর্তার অনেক সেবাদাসী আছে। তাদের সঙ্গে স্বামীকে ভাগ করতে আমার কোন আপত্তি নেই। কর্তা আমাকে ভালোবাসেন, আমিও তাঁকে ভালোবাসি। তাহলে বিয়েতে আপত্তি কোথায়?

আপত্তি আছে। মহারাজের গলার স্বর কঠিন, আপত্তির কারণ, এটা অনাচার। পশুদের মধ্যে যে রীতি চলে মনুষ্যসমাজে তা গ্রহণীয় নয়। এ বিবাহ সমর্থনযোগ্য নয়।

কলাবতীর প্রতিবাদে হলঘর গম গম করতে থাকে।

দাদা মহারাজ আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি মানি না। রাজপরিবারে দাদার বৌকে ছিনিয়ে নিয়ে ছোটভাই তাঁকে রানী বা রক্ষিতা করে সম্ভোগ করতে পারেন, রাজবাড়ির

সুন্দরী দাসীদের রাজারা গর্ভবতী করে দিতে পারেন, তখন তো অনাচার কথাটা উচ্চারিত হয় না? রাজার সন্তানরা এক্ষেত্রে রাজপুত্রের সম্মানও পায় না। তারা অবৈধ বলেই পরিচিত হয়। এটা অধর্ম নয়? অনাচার নয়? আমি এ পথে না গিয়ে স্বীয় অধিকার দাবি করেছি মাত্র, একি ন্যায়সঙ্গত নয়? আমি জানি দাদা মহারাজের বিয়েতেই শুধু আপত্তি। লোকচক্ষুর অন্তরালে আমাদের সম্পর্ক চলতে দিতে আপত্তি নেই। কারণ, তাতে রাজসম্মানে ঘা লাগে না। আপত্তি শুধু সামাজিক স্বীকৃতি দিতে। দাদা মহারাজ, আমি কি অন্যায় বলেছি?

বীরবিক্রমের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরায়। তাঁর গলার স্বর শুনে বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়েও দুজন রক্ষী কেঁপে উঠে। সম্ভাব্য বিপদের অপেক্ষায় প্রহর গোনে।

বীরবিক্রম রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, মূর্খ মেয়ে, তোমার সব কথার জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। শুধু এটুকু জেনে রাখো, আমি যতোদিন বেঁচে আছি এ বিয়ে হতে দেবো না। বাজপরিবারের সম্মান রাখতে যে কোন ব্যবস্থা নিতে আমি ইতস্তত করবো না।

এবার কণ্ঠস্বর নামিয়ে জীবনকুমারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মাইদেবতার মতামত জানা হল না।

জীবনকুমারীর চোখে জল। ধাতস্থ হয়ে বললেন, নক্ষত্র এবং কলাবতী যা বলেছে তা অস্বীকার করা যায় না। অন্তঃপুরিকাদের মান-সম্মান, সম্পদ, স্বাস্থ্য, বন্ধু-বান্ধবী সবই আছে। নেই কেবল প্রয়োজন। শরীরের প্রয়োজনও আছে কিনা সন্দেহ, অথচ শরীর নিয়েই জীবন প্রবাহিত হয়। শরীরই চেতনা বহন করে। এই শরীর প্রাণের আধার কিন্তু কেউ প্রাণের কথা জানে না, প্রাণের সঙ্গে বসতি বড়ই কঠিন। কারণ, প্রাণ রীতিনিয়ম মানে না, প্রাণ নিত্য। সত্যে তার অবস্থিতি। এদিক দিয়ে দেখলে আমি ওদের দোষারোপ করতে পারি না। কিন্তু জীবনের আরেকটা দিকও সত্য। রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করে রীতি-নিয়ম, আদব-কায়দা, আচার -ব্যবহারকে অস্বীকার করলে তাকে রাজপরিবার থেকে নির্বাসিত হতে হবে। যেমন হয়েছেন বড় ঠাকুর, নবদ্বীপ বাহাদুর এবং শচীন কর্তা। এ বিয়ে মানলে প্রজার চোখে রাজা হেয় হবেন। আমার ইচ্ছে, মহারাজ ওদের আরেকটা সুযোগ দিন। ওদের বিবাহের জন্য পাত্র-পাত্রীর খোঁজ করা যাক।

এবার লালু কর্তার বলার পালা। মন্ত্রী হিসেবে তাঁর বিবেচনা সমধিক গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিৎ। পিতা নয়, মন্ত্রী লালু কর্তাকে তাঁর বক্তব্য রাখতে হবে। রাজধর্মে দীক্ষিত লালু কর্তার বলার আগে মনে পড়লো, ৭ই বৈশাখ ১৩০৯ সালের একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে লিখেছিলেন—

'বৎস, তুমি ক্ষত্রিয়, তাহা কদাপি বিস্মৃত হইয়ো না। কোন শিক্ষায় কোন সঙ্গে তোমার তেজবীর্য্য ও শ্রদ্ধা যেন অভিভূত না হয়। অন্যায়, অত্যাচার, অধর্ম, অনাচার

হইতে দেশকে, সমাজকে রক্ষা করা, ইহাই ক্ষত্রিয়ের কুলব্রত। এমন পবিত্র উন্নত ব্রত আর কিছুই হইতে পারে না। ভয় ত্যাগ করিয়া, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া, দুঃখকে বরণ করিয়া, দৈন্যকে উপেক্ষা করিয়া, আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতবর্ষে ক্ষাত্রধর্মের আদর্শকে পুনরায় সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবার ভার তুমি গ্রহণ কর। সেই ভার গ্রহণ করিতে হইলে নিজের সমস্ত তেজকে হোমাগ্নির ন্যায় হৃদয়ের গোপন গুহায় অহরহ প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিতে হইবে।'

রবিঠাকুরের চিঠিটি লালু কর্তার হৃদয়-সমুদ্রে তুফান তোলে। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, মন চায় ওদের বিয়ে দিই, রাজধর্ম বলে—না। সংস্কার বলে—না। প্রজার হিতে রাজধর্ম সামাজিক রীতিনীতি মানতে বাধ্য। দুঃখিত, আমিও মহারাজের সঙ্গে একমত।

সভা সমাপ্ত। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর উঠে দাঁড়ালেন। কলাবতী বিদ্রোহী চোখে একদৃষ্টে নক্ষত্র কর্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার আরো অনেক কিছু বলার ছিল। তাকে বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি।



যেদিন শাড়ী বুকের খাঁজে পিছলে গেলো সেদিন থেকে নক্ষত্রের সঙ্গে তার ভাব। প্রাচীরঘেরা জীবনে কোন ঋতু সাড়া দেয়নি। সীমিত পরিবেশে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত এক স্বপ্নের জগৎ। সেখানে সুর, সঙ্গীত আছে, প্রতিধ্বনি নেই। ছন্দ ও গানের আড়ালে তা তরঙ্গ তোলে। একটি আলোকবিন্দু তাকে মুগ্ধ করেছিল, সে তার তমসা রাতের ধ্রুবতারা। যে তার গান গায়। তার সুর-ছন্দে সে থাকে।

আজ নক্ষত্র কর্তা যা বলেছেন, সে তো তারই মনের কথা। সেও তো এক খাঁচার পাখি, উড়াল দেবার উপায় নেই। শেকলবাঁধা এই খাঁচার কথা না বললে লোকে তার মনের কথা জানবে কি করে? কলাবতী কাগজ কলম নেন। ডায়েরী লেখেন—

আমার জন্মভূমি ত্রিপুরা, জন্মস্থান— ত্রিপুরার উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ। ১৪৯৪ একর জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে মূল প্রাসাদ। প্রাসাদের সম্মুখে কাজলকালো জলে ডুবো ডুবো দুটো সরোবর, সিংহদ্বার থেকে প্রাসাদের সিঁড়ি পর্যন্ত মধ্যবর্তী দুটি রাজপথ, সুবিন্যস্ত পুষ্পশোভিত উদ্যান এবং সবুজ ঘাসের শ্যামলিমা। মোগল গার্ডেন, মাঝখানে বৃহৎ ফোয়ারা এবং আরো অজস্র ফোয়ারার জলোচ্ছ্বাস সিংহদ্বার অবধি পরিব্যাপ্ত। রঙ্গীন মাছেদের খেলা—দুদিকে সাদা গম্বুজ পর পর শেকল পরানো একের সঙ্গে অন্যের সখ্যতা। সুরকিঢালা রাজপথ — তার দুপাশে জুনিপ্রাস বীথি, মাঝে মাঝে দেশী বিদেশী পাম, সবুজ আর মনোরম গাছগাছালি। রাজপ্রাসাদের প্রবেশ-পথে আটটি বৃহদাকার এবং আটটি ক্ষুদ্রাকার প্রতীক-সমন্বিত ষোলটি সিংহধৃত গজদন্তনির্মিত ও ছত্র আরঙ্গী তাম্বুলপত্র ইত্যাদি রাজচিহ্ন ভূষিতপ্রাচীন রাজসিংহাসন — চক চাঁদনী। রাজাসন পরিবহনের জন্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্মিত চতুর্দোলা। প্রথম হলঘরের উপরের ৮৬ ফুট গম্বুজের নিচে বিরাট পিতলের কমণ্ডলু। চারপাশের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে পিতৃদেব বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আঁকা ছবি—সন্ন্যাসী, ঝুলন। কাটগ্লাসের ঝাড়-লণ্ঠন, দেয়ালে বড় বড় লণ্ঠন, হাতির দাঁতের কারুকাজ, জেড পাথরের বুদ্ধমূর্তি, কাঁচের ফুল, বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, বাঁশের কাজ, বস্ত্রশিল্প। করিডোর দিয়ে পূর্বদিকে সংযুক্ত লাটমহল, শ্বেতমহল। অতিথিরা এখানে থাকেন। রাজপ্রাসাদের দোতলায় দরবার

কক্ষ, জলসাঘর, ড্রয়িংরুম, রিসেপশন ইত্যাদি ছবির মতো সাজানো।

মূল প্রাসাদটির অভ্যন্তরে পশ্চিমের দোতলায় লাইব্রেরী ও কাঠের মেঝের 'বলডান্স রুম'। মাঝখানে গম্বুজের নীচে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রলম্বিত রাজদরবার। উঁচুতে রাজ-সিংহাসন। দুদিকের দেয়ালে সারিবদ্ধ কাঁচের আলমারি। ওতে সুসজ্জিত বিদেহী মহারাজাদের জরির কারুকার্যে উজ্জ্বল আচকান, পাগড়ি, চোস্ত এবং তরবারি। দেয়ালের উপর পর পর আলমারির ফাঁকের অংশে গোলাকার করে ঢাল ও তার উপর 'ক্রশ' করে তরবারি সাজানো। এগুলো বিভিন্ন পরাস্ত-শত্রুপক্ষের রাজা এবং সেনাপতিদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্র, বল্লম, তির, ঢাল, তলোয়ার ইত্যাদি। রাজ-সিংহাসনের নীচে অর্ধগোলাকৃতি করে মন্ত্রীমণ্ডলী ও সভাসদদের বসবার জন্যে মূল্যবান মেহগনি কাঠের কুর্শী। মেঝেতে কাশ্মীরি কার্পেট। উপরে দামি কাঁচের তৈরি ঝাড়লণ্ঠন। পেছনে দোতলায় মহারানী, রানী এবং রাজকুমার-কুমারীদের দরবার-দর্শনের জন্য বসার জায়গা। প্রহরীরা রক্ষকের পোষাক পরে হাতে বল্লম নিয়ে সতত দণ্ডায়মান।

মজার ব্যাপার, মহারাজারা কিন্তু মূল রাজপ্রাসাদে থাকেন না। রাজপ্রাসাদের লাগোয়া পশ্চিম দিকে সুবিস্তৃত অন্দর-মহল। আমার পৃথিবীর সূর্য ওখানেই উঠতো ও অস্ত যেতো। মূল প্রাসাদে নিমন্ত্রিত না হয়ে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল। রাজপ্রাসাদের চৌহদ্দি তিন বর্গমাইলের মতো। তারমধ্যেও রাজকুমারী বা রানীদের ঘোরাফেরা নিষিদ্ধ ছিল। চিকের আড়াল থেকে আমাদের দরবারের নাটক, গান-বাজনা দেখতে এবং শুনতে হতো। গাড়ী করে বা ঘোড়ার গাড়িতে পেছনে দুই সহিস নিয়ে বেরোতাম কদাচিৎ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বা মেলা দেখতে। আমরা বেরোলে সাধারণ মানুষকে আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখা হতো। প্রাচীরঘেরা এ জীবন বিয়ের পর আবার আরেকটা প্রাচীরঘেরা মহলে আশ্রয় পেতো।

ভালোই ছিলাম। মন্দ ছিলাম না। সুখে ছিলাম। বড় হতেই মনে হল আমি কারাগারে আছি। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আমার মুক্ত বাতাস চাই। নক্ষত্রকে পেয়ে যৌবনের উদ্দামতা, মুক্ত বাতাসের সন্ধান পেলাম। কিন্তু তার আগে? কেমন কেটেছে আমার বাল্যকাল?

অনেক উৎসব হতো ত্রিপুরায়— বৈশাখী মেলা, বসন্ত উৎসব, দুর্গোৎসব, কের পূজা, দেওয়ালী, কার্তিক পূজা, মহারাস, বসন্তরাস, দোলপূর্ণিমা আরো কতো কী! শারদীয় বিজয়া উৎসবে সারা আশ্বিনমাসে সানাই বাজতো। ওস্তাদরা আসতেন। আসতেন সিদ্ধেশ্বরী, আখতারী বাঈ, আলাউদ্দিন খান, বাদল খান, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব

চট্টোপাধ্যায়। প্রতিবছরই আসতেন সেতারী এনায়েৎ, নৃত্যশিল্পী অলকনন্দা। কত্থক নৃত্য হতো। যাত্রা, নাটক, ঢপকীর্তন হতো। ফাল্গুনমাসে ঘরে ঘরে বাজতো বাঁশী, এসরাজ। হোলির জন্যে হারমোনিয়ামে গানের রেওয়াজ হতো। রাজ-অন্তঃপুরেও নাটক, যাত্রা, হোলিগানের রিহার্সাল হতো। মহারাসের মন্দির তৈরী হতো, খুপায়সৈ করতাল, মন্দিরা নৃত্য হতো মৃদঙ্গ বাজনার সাথে।

রাজ-অন্দরের অনুষ্ঠানকে নকল করেই খেলাঘরে পুতুলখেলা হতো। আমি একা একা পুতুল নিয়ে খেলতাম বলে আমার ধাইমা আদর করে আমাকে 'পুতুল' বলে ডাকতেন। আমার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রেশমের মতো চুল মুখে-চোখে আলুথালু হতো বলে বড় দুয়ারী আমার নাম দিয়েছিলেন - 'ঝাপুলি'। ছেলেবেলা থেকেই আমি ছিলাম অভিমানী, একরোখা, আমার মনে হতো দাস-দাসীদের জীবনেও স্বাধীনতা আছে। ওদের ছেলেমেয়েদের ওরা কতো ভালোবাসে, চোখের আড়াল করে না। অথচ হীরা, মণি, মুক্তা, মাণিক্যের, ধন-বৈভবের সংসারে আমি এতো একা কেন? সাধারণ শিশুদের যা সহজাত সম্পদ, পিতৃমাতৃ-সান্নিধ্য— তা পেলাম কই? রাজকীয় নিয়ম, আচার-ব্যবহারের যে প্রটোকল আছে তা নাকি লঙ্ঘন করা যায় না। সেসব মেনেই আমি বড়ো হয়েছি। জন্মের পরই ধাইমা বা দুধালী মায়ের প্রত্যক্ষ রক্ষণাবেক্ষণে শিশু-অবস্থা কেটেছে। দুধালী মায়েরও রয়েছে সদ্যোজাত শিশু, যে শিশু বেশির ভাগই স্বয়ং মহারাজের বা অন্য রাজপুরুষের। যদি দুটি সন্তানকে বক্ষসুধায় বর্ধিত করতে অক্ষম হন তাহলে তার গর্ভের সন্তানের জন্য বরাদ্দ হবে গরুর দুধ এবং তার বুকের দুধে বেড়ে উঠবেন রাজকুমার, রাজকুমারীরা।

জন্মের পর থেকেই আমরা জেনে যাই, আমাদের মা-বাবা সাধারণ মানুষ নন, তাঁরা মহারাজা, মহারানী। তাঁদের অনেক বাঁধাধরা নিয়মে চলতে হয়। আমার বাবা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য কদিন অন্দরে এসে আমাকে দেখতে চেয়েছেন কড়গুণে বলে দিতে পারি।

কোন ত্রুটি ছিল না শিক্ষায় দীক্ষায়। একটু বড় হতেই মেম গভর্নেস এসে গেলেন। তাঁর কাছে ইংরেজী, এমব্রয়ডারী, উলবোনা, ক্রসেট ইত্যাদি শিক্ষায় পারদর্শী হলাম। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে বাংলা, সংস্কৃত, কুমার বুদ্ধিমন্ত সিং এবং নবকুমার সিংহের কাছে শিখতাম নৃত্যকলা। গানবাজনা শিখতাম দাদা হেমন্ত কর্তা, লেবু কর্তা এবং অনিলকৃষ্ণ ঠাকুরের কাছে।

চিন্তার মোড় ঘুরে যায়। হঠাৎ মনে পড়ে মেসোর অনুরোধে পুতুলখেলা নিয়ে

এক দীর্ঘ রচনা লিখেছিলেন কলাবতী। নাম দিয়েছিলেন — খেলাঘর। আজ সেসব কথা বার বার মনে পড়ছে। কলাবতী তোরঙ্গ খুলে তার লেখা বের করেন। অতীত রোমন্থন চলে তারপর। মোহগ্রস্তের মতো কলাবতী পড়তে থাকেন—

কলাবতীর পুতুল-রাজ্যে রাজা-রানী, রাজকুমার-রাজকন্যা, উজির-নাজির, মন্ত্রী, লোক-লস্কর, সবই ছিল। তারা রাজ্যের নিয়মানুযায়ী খেলাড়ীদের প্রাণপ্রাচুর্যে চালিত হতো। পুতুল-রাজ্যে ত্রিপুরী, বাঙ্গালী, মণিপুরী, নেপালী, হিন্দী বহু ভাষার ও সংস্কৃতির মিলন ঘটেছিল।

রাজবাড়ির নিয়মের অনুকরণে প্রথমে মালি এসে ঘন্টায় আঘাত করে। কলরবে খেলা শুরু হয়ে যায়।

একটি মেয়ে পুতুলদুয়ারী সেজে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করে, কি কি এনেছো?

মালি-পুতুল হাতে আরেকটি মেয়ে ডালা নামিয়ে বলে, ফুলকপি, বেগুন, টমেটো, করুল, ঝিঙ্গা, ঢেড়স, সিম।

ওমা, বারমাসের সব্জী এনেছো যে। পান সুপারি আন নি?

মালি-পুতুলধারিনী বলে, আমি তা আনবো কেন? ও তো বাজার সরকার আনবে।

দুয়ারী ডাকেন, ও পঞ্চলক্ষ্মী, বাগানের সবজী এসেছে, মাইদেবতাকে দেখাও (মানে মাতামহারানীকে)।

পঞ্চলক্ষ্মী নামধারিনী আরেকজন এসে সবজি নিয়ে যায়। পঞ্চলক্ষ্মীর সাজ ত্রিপুরী মেয়েদের মতো। হাতের কব্জিতে চওড়া বাউটি, নাকে কলি (নাকফুল), বালি (নাকের গহনা), কানে তয়া, তাখুম। গলায় টাকার মালা, খোঁপায় গাঁদা ফুল, বুকে বাঁধা রিয়া, খাটো করে পরা হাতেবোনা পাছড়া।

বিজলীদুয়ারীর সাজ ছিল অন্তঃপুরিকাদের মতো। তিনবেড় দুবরা পরেছিলেন ভাঁজ দিয়ে দিয়ে, খাটো হাতা ব্লাউজ, চাদর গায়ে ছিল। কোমরে ঝোলানো ছিল একগুচ্ছ চাবি। প্রতিদিন সকালে তিনিই অন্তঃপুরের দরজা খোলেন।

সবজি দেখে রানী বলেন, রাঁধুনীকে ডাক।

মণিপুরী মেয়ের বেশে রাঁধুনী হাজির। তার নাম লৈপাকলৈ, কি চমৎকার নাম— মাটির ফুল।

রানীপুতুল বলেন, আজ কি কি রান্না হবে?

রাঁধুনী— করুল পীঠালি, মাছের ঝোল, ইরম্বা—

আরে হয়েছে হয়েছে, আর বলতে হবে না। রানী বলেন, রোজ রোজ ইরম্বা

কেন? সিঞ্জু জান না? আলু-আচার কর, শূয়রের মাংস ভর্তা কর—

বলা শেষ না হতেই রাঁধুনী বলে, মাইদেবতা, ওসব তো আমরা বৈষ্ণবরা ছুঁই না, নেপালী ব্রাহ্মণী বজৈরাকে ডাকুন।

এরপর আসেন নেপালী ধাইমা, তাকে দেখে সবাই খুশি। তিনি পঁচিশ হাত লম্বা শাড়ী কুঁচিয়ে পরেছিলেন, এমন না হলে কি ফরিয়া হয়? (নেপালীরা শাড়ীকে ফরিয়া বলে) ঐ ফরিয়া সামাল দিতে পাঁচহাত লম্বা পটুকা (কোমরপেট্টি) জড়িয়েছেন। লম্বা হাতা চোল (জামা) সরু, কোঁচান চাদর কাঁধের দুদিকে ফেলা হয়েছে। গলায় ছিল সোনার তিলরী অনেক গুচ্ছ পুঁতিমালায় গাঁথা। কেমন চমৎকার বিনুনী, লাল সুতোর ঝালর ওতে ঝুলছে।

ধাইমা রাঁধুনীকে বলেন, আটটা বাজে যে, তাড়াতাড়ি জলখাবার আন; ছেলেমেয়েরা এলো বলে।

ধাইমা নালিশ করেন, হুজুর! সান কুমারী ত স্কুল জান মানদৈন (স্কুলে যেতে চায় না)।

রানী বলেন, তেরো নানী (তোর খুকী) ফফায় ফুলাই লিয়ের যা (বুঝিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যা।)

জলখাবার এলো। ঝি ললিতা নিয়ে এলেন। তার বেশ বাঙ্গালী মেয়ের মতো, সেমিজের উপর শাড়ী পরা হয়েছিল। মাথায় ঘোমটা ছিল, কপালে সিঁদুর। চুড়ি, শঙ্খবালা পরেছিলেন। খেলাড়ীরা নিজ নিজ পুতুলদের পিঠে বাঁধা বই, ফ্রক, পেন্ট পরিয়ে এনেছিল। ওদের ধাইমা নিয়ে এলেন। ক্লাশ-রুমে এসে মাস্টারমশাই চেয়ারে বসলেন। বললেন, নামতা বল।

কলরবে নামতা পড়া হল........ চললো পড়ার খেলা কিছু।

এরপর সরস্বতী পূজা, কাঁসরঘন্টা বাজে। একের পর আরেক পর্ব চলতে থাকে। দুর্গা-পূজায় বাজে সানাই। কবিগান ও মাতৃপূজা-সঙ্গীতে পুতুলরাজ্য উৎসবে মেতে ওঠে। সিদ্ধেশ্বরী বাঈ, আখতারী বাঈ, অলকনন্দা, এনায়েৎ খাঁ নামধারী পুতুলদের একটা বড় হলে এনে বসানো হল। রাজা এলেন পারিষদ সঙ্গী-সাথী নিয়ে। গায়ক গায়িকা বাদকরা উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করলেন। চিকের আড়াল হতে রানী, মহারানী, কুমারীরা ও অন্তঃপুরিকারা শুনছেন, দেখছেন গান, নাচ। সিদ্ধেশ্বরী গাইলেন উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, আখতারী গাইলেন গজল, এনায়েৎ বাজালেন সেতার। খেলাটা বেশ

জমে উঠেছিল। রেকর্ডে গানবাজনা ব্যাকগ্রাউণ্ডে হচ্ছিল। পুতুলধারিণীরা হাবভাব করে গাইছিল, বাজিয়েছিল। অসুবিধা হল অলকনন্দাকে নিয়ে। কত্থক নাচতে গিয়ে পা ঠিকমত পড়ছে না দেখে সবাই হেসে ওঠে। অলকনন্দার মেজাজ বিগড়ে গেল, সে ঘুঙুর খুলে তবলচির দিকে ছুঁড়ে দিল। ঝগড়ার উপক্রম।

কলাবতী বললো, একি! একি! মারামারি করবি নাকি! খেলা নষ্ট হবে যে।

ওরা হাসবে কেন? দাও আমার পুতুল দাও, আমি তোমার রাজ্যে থাকবো না।

অলকনন্দা পুতুলধারিনী চলে গেলো। আজ অলকনন্দার জন্য খেলা তেমন জমলো না। মাঝে মাঝে ওরকম হয়।

এবার হবে দুর্গাপূজা। সবাই মহাব্যস্ত। দুর্গার কাঠামো সাজানো হল। আরতি, চক্ষুদান ইত্যাদি অনুষ্ঠান হল। বাজলো ব্যাণ্ড। রাস্তার ধারে সারিবন্দি মেলা বসলো। পাঁঠা বলি, মোষ বলি হল। দুর্গামণ্ডপে রাজাসন, তলোয়ার, শিরস্ত্রাণ থাকে। ওতে ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করা হল। এখন শোভাযাত্রা হবে। সবার আগে রাখা হল প্রভুবাড়ির দুর্গা, এরপর রাজ্যের দুর্গা, রাজপরিবার ও সার্বজনীন দুর্গামূর্তি সারি দিয়ে চললো... দশমী ঘাটে আরতি হয়, উলুধ্বনি হয়, ব্যাণ্ড বাজে। একশত এক বন্দুক ফায়ার করে সেলামী দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিগুলো জলে ভাসান দেওয়া হয়। তারপর সব মূর্তি পুতুলহাতি দিয়ে মাড়িয়ে দেওয়া হয়। ভগ্নমূর্তি নাকি দেখতে নেই, মাটির মূর্তি মাটিতে মিশে গেলো, বিষাদে আক্রান্ত হল মন। দশমীর দিন কারুকার্য-করা মন্দিরাকৃতি সিংহাসনে বসবেন রাজা, বামুন পুরোহিতরা মন্ত্র পড়ে ধানদূর্বা দেবেন — ওঁ শান্তি বলে। মন্ত্রী, উজির, নাজির, রাজপরিবার, ঠাকুরপরিবার উপস্থিত হবেন। প্রজা সমাবেশ হবে। দরবার হলে জ্বলবে সেন্ডেলিয়ার, রাজপথে সালু কাপড় বেছানো হবে। পান-দান, আতর-দান, মালা-চন্দনে অভ্যর্থনা হবে সমাগতদের। সব ব্যবস্থা হল— পুতুলরাজা, মন্ত্রী, পারিষদরা ও প্রজারা এলো, পুরুতরা আশীর্বাদও দিলো। আরে ভুল হল, ভুল হল, কৈ পরশপদী তো হল না, আসনভোজনও হল না। কলাবতী বললো, খেললে এমন দুয়েকটা ভুল হয়, তা বলে আবার আগেপিছে করে খেলবো নাকি? যা হয়ে গেছে হয়েই গেছে।

কার্তিক মাসে গান গেয়ে গেয়ে গরীব মেয়েরা কার্তিকঠাকুরের সাথে এলো।

বললো— উঠ, উঠ কার্তিকঠাকুর কত নিদ্রা যাও

পশ্চিমেতে কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হইয়াছে..........

সবাই তীর ধনুক নিয়ে সারারাত্রি জাগেন সেদিন। এক একটা বাসনে চাল ডাল সাজিয়ে সারি দিয়ে রাখা হয়। সুরু হয় বুড়োবুড়ি পূজা। বুড়োবুড়ির মূর্তি গড়ে প্রদক্ষিণ করা হল। বুড়োবুড়ী যে শিক্ষার সোপান।

আজকের মত বিশ্রাম। কাল বসন্তপঞ্চমী মেলা বসবে। কলাবতীকে অনেকগুলো কাপড় রাঙ্গাতে হবে। সবাই বসন্তপঞ্চমীতে বাসন্তী রংয়ের কাপড় পরবে, ফুল-চন্দন পরবে, আতর মাখবে। সে কাপড়ে রং দিয়ে আতর মাখে। আজকে তার অনেক কাজ।

আজ বসন্ত পঞ্চমী। খেলার সাথীরা সবাই এলো। কলাবতী বললো, ঐ যে, ঐ ঝোলাতে দেখ, ওতে সব আছে।

নারকেলের আংটি মালা দিয়ে তৈরী, নরুন দিয়ে ডিজাইন করা চমৎকার কুচকুচে পালিশ। নারকেলের মালা দিয়ে গ্লাস, বাটি, ফুলদান তৈরী করিয়েছে। বসন্তপঞ্চমী মেলায় ফুলের মালা, ফুলের পাখা, অলঙ্কার ইত্যাদির প্রতিযোগিতা হত। প্রথম স্থান অধিকার প্রতিবছর একচেটিয়া ছিল কলাবতীর। ঝোলা থেকে বেরোল কাগজের ফুল, মাটির হাতি, ঘোড়া, সোলার প্রজাপতি, টিয়া, কাঁথার মতো সেলাই করা সুজনী। পদ্মঝালব মশারী তৈরী করাতে পারে নি কলাবতী। এতো সময় কই? ত্রিপুরাতে ফুলের সাজ, পাখা, মালা ছিল দেখার মতো, নয়ন মনোলোভা। প্রাণগোপাল গোস্বামী যে-বছর ত্রিপুরায় প্রথম আসেন সে-বছর সাতদিন মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আত্মার শান্তি কামনায় ভাগবত পাঠ হয়েছিল। তখন ফুল দিয়ে যে শিল্প রচনা হয়েছিল কলাবতীকে তা শিখতে আগ্রহান্বিত করেছিল। বসন্তপঞ্চমীতে পুষ্পরথে ফুলের কাজের প্রতিযোগিতা হতো, খেলাঘরেও হল।

পরদিন হোলি উৎসব। সুরে-বেসুরে বাজলো তাদের হারমোনিয়াম, ঢোলক বাজলো তালে-বেতালে, কুমকুম ছড়াছড়ি হল। এখন গানের আসর বসবে। রাজা-রানী পুতুলকে সুজনী ঢাকা উঁচু আসনে বসানো হল। রাজকুমার, কুমারীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বসলো ফরাসে। এখন হোলির গানের প্রতিযোগিতা হবে। গাওয়া হল মহারাজা-মহারানীদের রচিত গান। কলাবতী গাইলো প্রপিতামহ বীরচন্দ্র মাণিক্যের লেখা ও সুরে হোলির গান—

হোরী - বসন্ত বাহার

আজু মন্দ মন্দ বহত পবন, বিরহীজন হৃদয় দাহন
পিয়া কি কারণ ঝুরত নয়ন, মাহেরী ফাগুন আয়েরী।
ফুটা রহি ফুল মালতী, গেন্ধী গোলাপ উজার সেউতি
ঔর বকুল চম্পক যুঁথি, অলিয়ানগণ গুঞ্জরে
মত্ত ময়ূর নাচত সঘন, হেরত বরজ যুবতীগণ
কোয়েলা কোয়েলী মধুকরগণ, দাস বীরচন্দ্র গায়েরী।

ঢোল বাজলো পুরোদমে, আবির খেলার হুড়োহুড়ি হল, কে জিতলো, কে হারলো তা নিয়ে ঝগড়াও হল। আজ সারাদিনের খেলায় ছেলেমেয়েরা ক্লান্ত।

মেলার মাঠে বৈশাখী মেলা খুব জাঁকজমকে জমে উঠেছে। জুড়িগাড়িতে আসছেন অন্তঃপুরিকারা, রোজদি কোচমান ঘোড়া হাঁকাচ্ছে, গাড়ীর পিছনে সহিস দুজন দাঁড়িয়ে আছে। রোলস-রয়েসে রাজা এলেন, সারি দিয়ে অনেকগুলো গাড়ী এলো, মহারানী, রানী, রাজকন্যারা, কুমারীরাও এসেছেন। ছোট বড় অনেকে কেউ সাইকেলে, কেউ হেঁটে এসেছে। পাহাড়-অঞ্চল থেকে বাসে করে যাতায়াত হচ্ছে। অলিগলি রাস্তার দুধারে পানের দোকান, পানীয় সরবৎ, ঘোলের সরবৎ, লেমোনেড বিক্রি হচ্ছে। অনেক দূর থেকে শোনা যাচ্ছে প্রফুল্ল সেনের গলার স্বর। ত্রিপুরার গঙ্গাপ্রসাদ (রাজপণ্ডিত রেবতী মোহন কাব্যতীর্থের পুত্র) এবং প্রফুল্ল সেন সকলের অন্তরঙ্গ, খুবই পরিচিত ছিলেন। ছেলেমেয়েরা প্রফুল্ল সেনের ম্যাজিক, প্রফুল্ল সেনের সরবৎ, প্রফুল্ল সেনের নাটক ও অঙ্কন-কার্য অবাক হয়ে দেখতো। প্রফুল্ল সেনের গলা নকল করে পুতুলধারিনী হাঁক দেয়— সরবৎ, ঘোলের সরবৎ। বড় রাস্তার উপরে দোকানগুলোর সামনে ভিড় উপছে পড়ছে। মনোহারী মালপত্র এসেছে কুমিল্লা, কলিকাতা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা থেকে। ফেরিওয়ালারা হাঁক দেয়। ডুগডুগি বাঁশী বাজে। কেনা-বেচার অনুকরণে হৈচৈ হতে থাকে।

মা এসে দেখেন, সবাই চেঁচামেচি করে খেলছে, কলাবতীর খেলায় মন নেই। মা বলেন, তুই তো সারাদিন পুতুল নিয়ে মেতে আছিস। যা না, তোর দিদিদের মতো দৌড়ঝাঁপ করে খেল না?

ও আমার ভালো লাগে না।

তাহলে নাচ-গান কর, মহারাস নৃত্য শেখ। ওরা কেমন চমৎকার গায়, নাচে।

বসন্তরাসে কি সুন্দর দেখায় তোর দিদিদের। তোর কি সাজতেও ইচ্ছে করে না?

কলাবতী ঝেঁজে উঠে বলে, ওরা আমার মতো কাজ করতে পারে? দেখ আমি কতো কাজ করি, এমনি এমনি বসে থাকি নাকি?

কলাবতী মা-কে একটি একটি করে দেখায় তার সব কাজ। মায়ের চোখে পলক পড়ে না। তিনি অবাক হন। বলেন, এসব তুমি করেছো? এই ফ্রক, এই শাল, বেডকভার, সোয়েটার, বাঁশের ফুল, পুতুল, এসব শিখলে কার কাছে?

কলাবতী উত্তর দেয়, কেন, পিসীমারা বোনেন না নাকি? ওঁদের দেখে শিখেছি।

মায়ের এবার বইয়ের দিকে নজর যায়।

একি করলে? পড়ার বইগুলো নষ্ট করলে কেন?

কলাবতী বলে, আমি নতুন বই বানাচ্ছি যে, আমার ছেলেমেয়েরা পড়বে। এই দেখ মহাভারত, রামায়ণ আরো কতো বই।

মা বিরক্ত হয়ে বলেন, ওপরের নামটাই আছে, না ভেতরেও কিছু আছে ?

কলাবতী ফিক করে হেসে বলে, আমি নাম দেখে দেখে লিখেছি, ভেতরে কিছু না হলেও চলে। মলাট সুন্দর হলেই হল।

তাই নাকি! আনো তো তোমার বইগুলো ?

অনেক বইয়ের কতকগুলো পাতা জুড়ে মলাট বাঁধানো হয়েছিল— লাল, নীল, সবুজ কাগজে। ওপরে লেখা কোনটায় মহাভারত, কোনটায় রামায়ণ, গীতা ইত্যাদি।

মা বই খুলে পড়লেন— গীতাতে — পাখি সব করে রব........

রামায়ণে— বদর বদর বলে, পাল তুলে সবে মিলে.......

মহাভারতে — রাখাল বড় দুষ্টু ছেলে........

মা-র বোধহয় হাসি পাচ্ছিল কিন্তু গম্ভীর হয়ে বললেন, কাল থেকে তোমাকে গান শেখাবো। তুমি রাধাকৃষ্ণ ঝুলনে গাইবে। শুধু পুতুল নিয়ে থাকলে চলবে না।

তারপর একদিন নাটক হল। প্রিয়তম কৃষ্ণ বাঁশী বাজালেন। নাচের ভঙ্গিমায় গোপিনীরা এলেন, কলাবতীও তাদের সাথে এলো কিন্তু রাস আরম্ভ না হতেই রসভঙ্গ হয়ে গেল। রাধার স্বর হারমোনিয়ামে মিলছে না। সা থেকে বাজালে রাধা তিন পরদা আগে মা থেকে গায়। কলাবতীর যে মা-ই ভরসা। অসহায়ভাবে সে মা-র দিকে তাকায়। এদিকে কৃষ্ণবেশধারিণী দিদিটি কলাবতীকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই রাধার গান গাইতে লাগলো, চুরি করে কেন মন নিলে......... কলাবতী অবাক হয় কৃষ্ণের কাণ্ড

দেখে, রাধাকে বাদ দিয়ে একাই ঝুলনায় ঝুললেন, প্রিয় সখী ললিতা, বিশাখা, বৃন্দা কারুর কথাই শুনলেন না, রাধাকে গ্রাহ্যই করলেন না। তা দেখে রাধা মা-কে অনুযোগ করে বলে, তোমাকে আগেই বলেছিলাম, পারবো না। কেন আমাকে দিয়ে নাটক করালে? কলাবতী দর্শকদের সামনে মাথার মুকুট, পায়ের ঘুঙুর খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। মুক্তোমালা ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

কৃষ্ণ ঝুলতে ঝুলতে মজা দেখেন, রাধা অভিমান করেছে দেখেও মান-ভঞ্জন করেন না। রাধা কাঁদেন, কৃষ্ণ হাসেন। পিসিমা এসে রাধাকে কোলে তুলে নিলেন দেখে দর্শকদের একজন ঠাট্টা করে বলে, যশোদারানী রাধাকে কোলে নিলেন দেখ।

ও কথায় কান না দিয়ে পিসিমা কলাবতীকে বোঝান, তুমি সবচাইতে ভালো গাইতে পারো। তোমার সাথে পরদা মিলিয়ে বাজালেই তো হতো। এবার থেকে আমি বাজাবো, তুমি গাইবে, কেমন?

কলাবতী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, না।

এই 'না' যে কী তা মা, মাসি, পিসি সবাই জানতেন।

পিসিমা বলেন, লক্ষ্মী মেয়ে, চল, চল, পড়াশোনা করবে চল।

কলাবতী রঙ্গমঞ্চ হতে বিদায় নিলো।

কলাবতী তার পুতুলকন্যা নিয়ে মহাভাবনায় পড়েছে। নানা দেশ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসছে, কিন্তু মনের মতো হচ্ছে না, কী করা যায়! সেই কলহকারী কৃষ্ণের ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে? তা হতে পারে না।

একদিন কৃষ্ণ নিজেই এলেন। কলাবতীর সঙ্গে ভাব করতে চেষ্টা করেন। বলেন, আমি তোর মেয়েকে খুব যত্নে রাখবো।

না, তোর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো না। কক্ষনো না।

কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র রচনা করে বলেন, কেন হবে না শুনি? আমি জোর করে নিয়ে গেলে তুই কী করবি?

বোধহয় রুক্মিণীহরণ করতে চান। অগত্যা কলাবতীও যুদ্ধঘোষণা করে চণ্ডিকার মতো বলে, নিয়ে যা দেখি?

কৃষ্ণ সাবধান করে, ঐ তো শরীর, পারবি আমার সাথে?

কলাবতী কথা না বলে ঝাঁকড়া চুল সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তার চোখ স্থির, ভ্রূ কুঞ্চিত, শরীর তীক্ষ্ণ। ফর্সা গালে রক্তাভা দেখা দেয়। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর এমন রূপ

দেখবেন ভাবেন নি।

কলাবতী বলে, এসো কী নিতে চাও, এই টি-সেট? এই নাও। এটা নেবে? এই নাও।

কলাবতী হাতের কাছে যা ছিল সব ভাঙ্গতে সুরু করলো। এই প্রলয়কাণ্ড দেখে কৃষ্ণ মেয়েটি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। শান্ত আকাশে বৈশাখের ঝড় উঠেছিল সেদিন। ধাইমা দৌঁড়ে আসেন। কি হল, কি হল, বলে থামাতে চেষ্টা করেন কিন্তু সামনে যাবার উপায় নেই। পুতুলরাজ্যে ধ্বংসলীলায় মেতেছে কলাবতী।

পিসিমা কৃষ্ণকে আগলে নিয়ে বললেন, ও লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটার সাথে ঝগড়া করো না। আমি তোমাকে সুন্দর রাজকন্যা দেবো। দেখলে তো ও কিছু দেবে না, গেল, গেল, সব গেল, এই কলি! লাগবে যে, কি করছিস্?

কৃষ্ণ বলে, ছোট মা, ও ছোট মা, দেখ দেখ রাধার কাণ্ড দেখ।

কলাবতীকে মা এসে থামালেন। কলাবতী বললো, মা-র কাছে লাগাতে হবে না, যা, যা সব নিয়ে যা— এক্ষুনি নিয়ে যা।

মা বলেন, ছিঃ লক্ষ্মীসোনা, ও কথা বলতে নেই, ও যে তোর দিদি।

তা বলে জোর করে নিয়ে যাবে? এরপর কৃষ্ণকে বলে, পারলি নিয়ে যেতে?

মা কলাবতীকে বকুনি দেন, চুপ কর বলছি।

কৃষ্ণ ফুঁপিয়ে কাঁদে, বলে, ছোটমা, আমি আর কক্ষনো আসবো না।

কৃষ্ণকে কাছে টেনে ছোট-মা ওর চোখ মুছিয়ে দেন। কোলে বসিয়ে লজেন্স, খেলনা কত কি আনিয়ে কৃষ্ণকে তুষ্ট করেন। বলেন, তোর ছোটবোনকে আদর করে যা।

কৃষ্ণ কলাবতীর হাত ধরে চুমু খায়। বলে, তুমি আমার ছোটবোন, আমি তোমার দিদি, আর কখনো ঝগড়া করবো না।

এবার কলাবতীর দুগাল বেয়ে জল ঝরে। অনেক অনেক অভিমানের অশ্রুজলে চোখে অন্ধকার দেখে সে।

ঝগড়া মিটমাট হয়ে গেল। ফাল্গুনে কন্যার বিয়ে ঠিক হল। বিয়ের তালিকা তৈরী হল। জামাই বরণের আংটি, শিরপেজ থেকে আরম্ভ করে কিছুই বাদ রইলো না।

কলাবতী মহাব্যস্ত। বাঁশের ঝালর ঝাপটি দিয়ে বেদী সাজান হয়। নানা রংয়ের পাঁচিশটা চাঁদোয়া খাটানো হল (যেমন রাজকুমার-কুমারীদের বিয়েতে রাখা হয়)। বেদীর চারদিকে সবুজ পাতাযুক্ত দীর্ঘ বাঁশের খুঁটিতে চাঁদোয়াগুলো একে একে বাঁধা হল। বাজলো সানাই। মেয়েরা জল ভরতে নদীতে যায়। সোনার লাঠি, রুপোর লাঠি

নিয়ে লাঠিয়ালরা আয়াজুর পাল্কীর সঙ্গে আগে পিছে যায়। হাওড়া নদীতে আয়াজু জল ভরেন। আয়াজু— আয়েস্তা মেয়ে, তাঁর পরনে লাল বেনারসী শাড়ী, চাদর, নানা অলঙ্কারে সেজে কপালে সিঁদুর পরে জল ভরেন তিনি। ঐ জলে কনের স্নান হবে। অধিবাস হয় বিকেলে। বরপক্ষ হতে আসে রিয়া, চাদর, গহনা। পাহাড়ী পুরোহিত লাম্প্রা পুজো করেন হাঁসের ডিম, মদ ইত্যাদি দিয়ে।

পরদিন বিয়ে হবে। বর আসবেন হাতির পিঠে হাওদায় বসে। সারিবন্দি মিছিল হবে, লোক-লস্কর, আতসবাজি, বাদ্য-বাজনা, ব্যাণ্ড বাজবে। আলাউদ্দিন খানের পিতা সদু মিঞার - নাগার্চী দল (ব্যাণ্ড পার্টি) এসেছে। কিশোর আলাউদ্দিনের বাদ্য-বাদন সবাইকে মাতিয়ে দিয়েছে। সবই রাজবাড়ির নিয়মমাফিক হচ্ছে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বরযাত্রী হয়ে পুতুল-রাজকুমারের সাথে আসে। শাঁখ বাজে, বর হাতি থেকে নামেন। আয়াজু তাঁকে বরণ করেন বেদীদ্বারে। তারপর পিঁড়িতে করে কনেকে আনা হল (বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত মাটিতে পা রাখতে নেই বর-কনেকে)। দীর্ঘ পথ সালু কাপড়ে ঢাকা ছিল বর-কনের সম্মানার্থে। বিয়েপর্বের প্রারম্ভে কনে মালঞ্চ ভাঙ্গে, সই কামিনী গাছকে কোল দেয়। একটা শাখা ভেঙ্গে মালঞ্চ হতে বিদায় নেয়; তারপর হয় শুভদৃষ্টি। সালু কাপড়ে ঢাকা দুটো ডালায় পদ্মপাপড়ি সাদা কাপড়ে তৈরী হয়, ওতে থাকে রুপোর চাঁদ, সোনার সূর্য। ঐ সাজানো ডালা দিয়ে আড়াল করে কনেকে আনা হয়। বর-কনের পিঁড়ি মুখোমুখি উঁচু করে ধরে বলা হয় — দুজনে দুজনকে দেখ। শুভদৃষ্টি হয়ে গেলে মালাবদল। কনে বরের মাথায় আঙ্গুলের শৈল্পিক কায়দায় পুষ্পবৃষ্টি করার পর সিঁদুর পরানো হয়। বেদীতে কন্যা সম্প্রদান করার পর জুয়া পাশা খেলার জন্য বর-কনেকে নির্দিষ্ট এক ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। আয়াজু খেলা সম্পন্ন করেন। কন্যাপক্ষ, বরপক্ষ ও বর-কনের সাথে খেলার আসরে বসেন।

আয়াজু বর-কনের সামনে আলপনা আঁকা একটা হাঁড়ি রাখলেন। কুলোর উপর ধানের রাশিতে তা বসানো হল। ধারাগত ভাবে যা হয়ে আসছে, খেলাতেও তাই হল।

বর-কনের হাত ঢাকনা দিয়ে চাপা হয়, বলা হয়, এখানে কড়ি আছে, হলুদ আছে, হরিতকী আছে আর একটা আংটি আছে, যে পাবে আংটি, সে জিতবে। এক-দুই-তিন বলার সাথে বর-কনে হাঁড়ির ভেতর হাত দিয়ে যা পায় তা তুলে নিয়ে মুঠো খুলে দেখে, কে জিতেছে? বরের হাত ঢাকনা দিয়ে চেপে রাখায় জয় হল কনের।

কনেকে কি দেবে বলো? কন্যাপক্ষের আব্দার। বরপক্ষ থেকে বলা হল, হীরের

চুড়ি দেব বরসেবার জন্যে।

কনেপক্ষ হা হা করে উঠতেই বরপক্ষ পিছু হটলো।

বেশ বেশ হাত খুলছি কনেসেবার জন্যে।

অভিভাবকরা এ খেলা দেখে সেদিন হেসেছিলেন, ভুলে গিয়েছিলেন এ পুতুলখেলা।

তারপর নিমন্ত্রিতদের সত্যি সত্যি লুচি মাংস, রসগোল্লা, সন্দেশ, দই খাওয়ানো হয়েছিল। এর জন্যেই বিশেষ ঘটা যেন।

যখন কনে বিদায়পালা সুরু হল, কন্যাপক্ষের সবাই কাঁদলো নিয়মমতো। কলাবতীর চোখের জল নিয়ম মানলো না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। কনেকে বিদায় দিতে গেলো না।

কৃষ্ণাদিদি তার চোখ মুছে দিয়েছিল। সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, একসঙ্গেই তো খেলবো।

মা-মাসিও বলেছিলেন, মেয়ে বিয়ে দিলে তো পরের ঘরে যাবেই। খেলায় কি সত্যি সত্যি কেউ কাঁদে নাকি? ওদের চোখও ছলছলিয়ে উঠেছিল কলাবতীর কান্না দেখে।

মা সেদিনের খেলা দেখে বললেন, এমন পুতুলখেলা আর নয়।

কলাবতী মার কথায় রাগ করে তক্ষুনি উঠে পড়লো। একটা ঝোলায় রাজ্যপাট পুরে হনহন করে চলে গেলো।

মাসি কলাবতীকে আসতে দেখে বলেন, সোনামণি ওটায় কী এনেছো?

কলাবতী বলে, কী আর হবে, আমার সব তুলে আনলাম। আমি এখানেই খেলবো।

মাসি হেসেহেসে মেসোকে বলেন, দেখ, দেখ ঐটুকু ঝোলায় রাজ্যসংসার তুলে এনেছে?

মেসো — বেশতো, এখানে খেলুক।

কলাবতী দরজা জানলার পর্দা খুলে নিয়ে পুতুলরাজ্যের সীমা ঠিক করে, আবার নতুন করে সংসার পাতে। অখন্ড ত্রিপুরারাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হল। প্যালেস কম্পাউণ্ডে ছাড়পত্র নিয়ে আসতে হয়। হলট্, হু কামস দেয়ার-এর জন্য একটা পুতুল সঙ্গীন উঁচিয়ে রাখা হল। একটা পুতুলকে চেয়ারে বসানো হল, তার চারপাশে অনেকগুলো পুতুল বসে।

মেসো জিজ্ঞেস করলেন, ঐ যে চেয়ারে বসলেন, উনি কে? আর এরা কারা?

কলাবতী বলে, পণ্ডিতমশায় আর এরা ছাত্র-ছাত্রী। পণ্ডিতমশায় পড়াবেন, এরা পড়বে।

কিন্তু দেখা গেলো পণ্ডিতমশায় পড়ান না, ছেলেমেয়েগুলোও পড়ে না, তারা বসেই থাকে। তা দেখে মেসো বললেন, এরা পড়বে না? এমনি বসে থাকবে?

গম্ভীর ভাবে কলাবতী বলে, তোমাকে ভাবতে হবে এরা পড়ছে। পণ্ডিত পড়াচ্ছেন।

তাই নাকি? মেসোর মুখে হাসি খেলে যেন। চোখে অবাক ঝিলিক।

তা নয় তো কি? আমি ওদের পড়াবো নাকি?

তাহলে তো ভালোই হয়—মেসো বলেন।

তুমিই বলো না মেসো, আমি কি পড়াই?

আচ্ছা ঠিক আছে। আমি পণ্ডিত নিয়ে বসবো, তুমি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বসো।

আচ্ছা, আচ্ছা তুমিই পড়াও, আমি শুনি।

মেসো গীতা নিয়ে আসেন, বলেন, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ.....

কলাবতী অবাক হয়ে বলে, এ সব তুমি কী বলছো, ক-খ-গ-ঘ না বলে?

মেসো বলেন, মহাভারতে পাণ্ডব-কৌরব যুদ্ধ হয়েছিল তার গল্প বলছি। তুমি গল্প শুনতে ভালোবাস?

কলাবতী মাথা হেলিয়ে বলে, খুব ভালোবাসি। ধাইমা কতো গল্প বলে নেপালের। দুধুমা বলেন, ডাইনী বুড়ির গল্প। সে নাকি গোমতী নদীতে মন্ত্র পড়ে বাঁধ দিয়েছিল। শত্রুরা যখন ত্রিপুরায় এলো, বাঁধ ভেঙ্গে দিলো। তারা জলের স্রোতে কোথায় ভেসে গেলো। যুদ্ধ জিতে রাজা ডাইনীকে অনেক পুরস্কার দিলেন। রাঁধুনী মা বলে টিকেন্দ্রজিৎ যুবরাজের গল্প.........

মেসো জিজ্ঞেস করেন, তোমার মা মাসি কোন গল্প বলেন না?

ওরা তো শুধু বলে— পড়, নাচ, গাও। তাই তো চলে এলাম।

আমি তোমাকে অনেক গল্প বলবো। রোজ বিকেলে এসে সন্দেশ খাবে, গল্প শুনবে। বংশীধারী পুতুল কৃষ্ণ কিনে দেবো। ও পুতুল কি বলে জান? বলে, আমায় নিবি কিগো— রাখবি ঘরে /আমি ফিরি সবার ঘরে, দোরে দোরে..............

পড়া শেষ হলে কলাবতী অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকেন। শিশু-বয়েসটা যেন অনেকদিন বাদে আবার হানা দিল। জীবন এতো জটিল আগে কে জানতো? লেখাটা শেষ করা হয়নি। এতোদিন বাদে কলাবতী উপসংহার লিখতে বসলেন—

জন্মের পর সতেরো বছর শান্তিতে ছিলাম। তারপর? শিশুবেলার কথা যা লিখেছি

তাতে রাজ-অন্তঃপুরের জীবনকেই ধরার চেষ্টা হয়েছে। বাস্তবেও এমনটিই ছিল রাজ-অন্তঃপুরিকাদের জীবন। ধরাবাঁধা জীবন, অচলায়তন— না আছে গতি না আছে স্বাভাবিকতা। তবু জীবন চলেছে তার নিজস্ব পথে। এই পথের গতিকে বাধা দেবার সাধ্য কারও নেই। চলার পথে যাঁদের ফেলে এসেছি, সঙ্গে যাঁরা চলছেন, প্রতীক্ষায় যাঁরা আছেন তাঁদের বাদ দিলে জীবনের বিচার করা যায় না। এই তো আজ কিছুক্ষণ কাঠগড়ায় দাঁড়ালাম। আমি সামাজিক প্রসাধনের আড়ালে থাকি নি, কোন সত্যমিথ্যায় জড়িত নই বলে সাক্ষী-সাবুদেরও প্রয়োজন নেই। আমি ভীষণ সত্য। বেসুরো গায়িকা, অখ্যাত শিল্পী, অপরিণামদর্শী, আত্মঘাতী মানুষ আমি। আমাকে ফাঁসি দেওয়া যাবে না, জেলেও রাখা যাবে না, কারণ জেলেতে থেকেই অভ্যস্ত আমি। এ এমন কিছু নতুন নয়। এমন কোন শাস্তি নেই যা আমাকে দেওয়া যায়। আমার বিচার করতে বিচারকরা হুকুম জারি করলেন। এ আমি সইবো কি করে? প্রিয়জনেরা হতাশ চোখে অশ্রু বিসর্জন করবেন—এ আমি সইতে পারবো না। মৃত্যুভয়ও নেই আমার, কারণ মৃত্যু মানে তো একটি কাহিনীর পরিসমাপ্তি মাত্র। পৃথিবীটাই আমার কারাগার। আমার আবার কিসের ভয়? গানে আনন্দ, তাল কেটে যেতো তবু আমার কুঞ্জে আমি পাখি।

সেদিন পূর্ণিমা। চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙ্গেছে। নীলাকাশ জুড়ে তারাদের ভীড়। আজ মহারাস। বাঁশের খিলান দিয়ে, গোলাকার করে মণ্ডপ তৈরী হয়েছে। ঘনঘন সবুজ পাতায় জাফরি ছাওয়া হয়েছে, গোপীকাদের পথ আলাদা রেখে প্রতিটি খিলান নিয়ে সাদা কাপড় টেনে নির্মিত হয়েছে আলাদা আলাদা পার্টিশন। এর ভেতর পুরু পুরু গালিচায় ফরাস পেতে তাকিয়া রাখা হয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য। রাজা, মহারানী, কুমার-কুমারী এবং রাজপরিবারের জন্য পদ্মাঙ্কিত কারুকার্য করে সেলাই করা সুজনী বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোপীকাদের প্রবেশ-পথ হতে আরম্ভ করে মণ্ডপদ্বার পর্যন্ত দীর্ঘপথ নির্মাণ করা হয়েছে রেলিং-এর মত করে এক-হাত উঁচুতে জাফরিতে সালু মুড়িয়ে। মণ্ডপের ভিতরেও সীমারেখা আছে। মাঝখানটায় রাধা-শ্যামের সিংহাসন রাখার বেদী। ঘন করে পাতায় মোড়ানো সিলিং-এ রাখা হয়েছে পাতার আড়ালে আড়ালে রঙ বেরঙের বাল্ব। আলোর নাচানাচি হবে। রাজ-অন্দরে মহারাস আরম্ভ হতে আর বেশি দেরি নেই। অভ্যাগতরা নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। বিবাহিতা রাজকুমারীরা, রাজা-মহারানীর সঙ্গে কুমাররা, কুমারীরা ও তাঁদের রানীরা এলেন। নৃত্যশিক্ষক ও রাসধারিণীরা স্ব-স্ব জায়গায় বসলেন। সবাই মহারাজ বীরবিক্রম ও মহারানী কাঞ্চনপ্রভার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মহারাজা বীরবিক্রম আসতেই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে রাজ-অভ্যর্থনা করলেন। যথারীতি সবাইকে ফুলচন্দন দেওয়া হল। রাসধারিণীরা তাদের ঝকঝকে মন্দিরা তুলে নিলেন। ঝালর-বাঁধা মন্দিরা দুলিয়ে দুলিয়ে প্রথমে গুরুবন্দনা করার পর রাধার রূপবর্ণনা করা হয়। মৃদঙ্গবাদকরা পায়তারা করে নৃত্যভঙ্গীতে মৃদঙ্গ বাজান— গোলাকার সীমার মধ্যে আসেন।

গোপীকারা সারি দিয়ে দাঁড়ান। ওদের পাসোয়ান কুমীরের ঘুঙুর ও অলঙ্কারের শিঞ্জন শোনা যায়। তারা একে একে প্রবেশ করেন নৃত্যভঙ্গীতে, তালে তালে। রাসধারিণীরা গাইছেন—

কামিনী সঙ্গে, চলিল রঙ্গে
আওত ব্রজরঙ্গিনী রাধে।

তার কটিতে কিঙ্কিনী, হার তরঙ্গিনী,
পিঠে পড়ে বেণী দোলনা
বন্ধুর নাম জপি, জপি রাই ধনী
বাউরী মত।

রাসনৃত্যে ব্রতধারিণীরা গোপীর সঙ্গে প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন ছিলেন। এদের সাথে কলাবতীও ছিলেন। সবার মতো সে-ও ফুলের মালা চূড়া করে বাঁধা চুলে জড়িয়েছিল। কানের পাশে তা দুলছে। মুখ ঢাকা ছিল স্বচ্ছ কাপড়ে। পায়ে আলতা, সোনার নূপুর, কানে ফুল, বাজু, সাতনরি সবই পরানো হয়েছে। তার পদক্ষেপ, ভঙ্গিমা সবার নজর কাড়ছিল। হীরার হারটা হৃৎস্পন্দনের সাথে ধক ধক করে দুলছিল। আজই প্রথম সে মহারাসে যোগ দিয়েছে। তার কানে গেলো, লতার মতো নাকি তার শরীর। সে শুনলো রূপের প্রশংসা..............

পাতার আড়াল হতে মাঝে মাঝে হলুদ, লালআভা এসে মুখে পড়ে কলাবতীকে মোহময়ী করে তুলেছে। আলো প্রবর্তক হয়ে ঘুরছে। কৃষ্ণচক্র পৃথিবীতে আলো আঁধার সৃষ্টি করে। রাধাশ্যাম ত্রিভঙ্গ হয়ে ত্রিকাল বাঁশি বাজান নাকি! তিনবার আরতি হয় মাতা বড়মহারানীর মন্দিরে।

শঙ্খবাদন হল। সারি দিয়ে দু লাইনে গোপিনীরা দাঁড়ায়। উপস্থিত সকলে মহারাজা মহারানীর সাথে উঠে দাঁড়ালেন। রাধাশ্যাম আসছেন মহাসমারোহের সঙ্গে। ছত্র-চামর, ময়ূরপাখা-ধারিণীরা সাথে সাথে আসছেন। গোপিকারা গাইলো—

জয় জগতবন্দিনী, হরি হৃদয়রঞ্জিনী,
ব্রজরমণী, মুকুটমণি, রাধিকে
শ্রী রাধিকে..........

পূজারিণীরা যুগলমূর্তি স্থাপন করলেন বেদীতে রাখা সিংহাসনে। আরতি হল, নির্মাল্য দেওয়া হল মহারাজকে। প্রণাম করে সকলে আবার আসন গ্রহণ করলেন।

গোপিকাদের সঙ্গে কিশোরী কলাবতী বেশ চমৎকার নাচছে। মৃদঙ্গের বোল যখন ওঠে, গোপিকাদের মধ্যে যখন যার ডাক পড়ে, সেই গোপী নূপুর ও অলঙ্কারাদির শিঞ্জন অটুট রেখে শ্যামের মুখোমুখি হন। প্রণাম করেন, এরপর শিক্ষানুযায়ী মুদ্রা ও ভঙ্গিতে নৃত্য করেন বিবিধ ছন্দে - লাস্যাদি ভঙ্গিমায়। কলাবতীর ডাক আসে। রুনুঝুনু শব্দ তুলে সে অগ্রসর হয়। মালা দেওয়ার ভঙ্গিতে নৃত্য করে। অপাঙ্গে তাকায়। ঐ সময় যে ছেলেটি একটু দূর হতে তাকে দেখছিল, তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কলাবতীর সারা শরীরে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেলো। কলাবতী পুরুষের চোখের

ভাষা পড়তে শিখেছে। সে আর ছোটটি নেই। সে জানে, এ দৃষ্টিতে শুধু বিহ্বলতা নয়, কামনাও জড়িত। অচেনা নয়, খুড়তুতো ভাই। ওর সঙ্গে ঝগড়া হয়, তর্ক হয়। তাকে কলাবতী দস্যু বলে ডাকে। আজ তার চোখে সে কী দেখলো!

রাস শেষ হতে আর বেশিক্ষণ নেই। তারাগুলো নিভে আসছে, নবোদয় সূর্যের সোনালী আলোয় স্নাত হয়ে রাধাশ্যামের বাঁশি যেন কলকাকলিতে বাজলো। পুরোদমে নৃত্য উন্মাদনায় মৃদঙ্গ, মন্দিরা বেজে চলেছে। দ্রুততালে ঘুরে ঘুরে নৃত্য হওয়ার পর রাস সমাপ্ত হয়। আরতি হল, শঙ্খ-ঘন্টা বাজলো, সবাই উঠে দাঁড়ালেন। এরপর নত হয়ে ভূমিতে মাথা রাখেন সবাই। শ্যামসুন্দরকে নিয়ে পূজারিণীরা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলেন।

সবাই চলে যাবার পরও ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে ঠায়। কলাবতীর লক্ষ্য এড়ালো না। ওর চোখে কলাবতী কি তার সর্বনাশ দেখতে পেয়েছে? তাহলে আজ তার বুক ভয়ে দুরু দুরু কেন? কয়েকবার দেখা হয়েছে। কই, আজকের মতো লজ্জা তো তাকে সাপের মতো বেষ্টন করে নি? কলাবতী নিজের মনকে যাচাই করছে। ভাবনার তরঙ্গে হারিয়ে যাওয়া কলাবতী হাতের স্পর্শে সম্বিত ফিরে পেয়ে বললো, দাদা নক্ষত্র, কিছু বলবে?

নক্ষত্র তার হাত ধরে বললো, এখানে নয়, চলো বাগানে যাই।

কলাবতীকে হাত ধরে প্রায় টেনে বাগানে নিয়ে এলো নক্ষত্র। সূর্য উঠি উঠি করছে। হিমেল হাওয়ায় গা জুড়িয়ে যায়। দুজনে একটা পাথরের বেঞ্চিতে বসলো। কাছাকাছি। কলাবতী জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমাকে অমন করে দেখছিলে কেন?

বারে, তোমাকে দেখতে নেই নাকি?

আছে। তবে অমন করে নয়।

নক্ষত্র ঠাট্টা করে বলে, রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর। তোমার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। দেখছিলাম রণচণ্ডী কি করে রাধা হয়ে গেলো? তোমার মধ্যে যুগল রূপ দেখলাম যে।

কলাবতী বললো, তুমি তো ঈশ্বর মান না, রাধাকৃষ্ণের কথা বলছো কেন? বল, বন্দেমাতরম।

নক্ষত্র গভীরস্বরে বললো, তুমিই আমার রাধা, এতোদিন বুঝিনি।

কলাবতী বললো, ছিঃ, ছিঃ কী সব বলছো! আমাদের সম্পর্ক ভুলে গেলে চলে?

কিসের সম্পর্ক? তোমাকে আমি কতটুকু দেখেছি? আমরা একসঙ্গে মানুষও হই নি। তুমি বড় হয়েছো উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদে, আমি বাবার মহলে। ছেলেবেলায় মানছি,

কখনো সখনো দেখা হয়েছে। কিন্তু সে তো পুতুলখেলায়। ছ'বছর বয়সে ঢাকায় সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে চলে গেছি। ম্যাট্রিক দেবার পর এই তো আমাদের প্রথম দেখা। আমার আগের চোখ যে পালটে গেছে রাজনন্দিনী। আমার যে তোমাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে?

এমন সরাসরি কেউ প্রেম নিবেদন করতে পারে ভাবতেও পারে নি কলাবতী। বয়ঃসন্ধির এ সময়টা মন হু হু করে। নিষিদ্ধ যা কিছু পেতে মন চায়। মনকাড়া পুরুষের সঙ্গ ভালো লাগে। মা কতোবার বুঝিয়েছেন, এ সময়টা খুব খারাপ। রাখঢাক করে চলবে। এমন কাজ কোরো না যাতে আমাদের মান যায়।

কলাবতী নক্ষত্রের দিকে মেদুর চোখে চেয়ে থাকে। বাধা দেবার শক্তি হারিয়ে গেছে। তার শরীর অসাড়। পা আটকে গেছে মাটিতে। কী উত্তর দেবে বুঝতে পারছে না। ঠোঁট কাঁপছে। কলাবতী ঘামছে। ভীত স্বরে বললো, আমার ভয় করছে।

নক্ষত্র হাসে, বলে, কিসের ভয়?

নক্ষত্র এবার গান ধরে—

আজ রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখলু পিয়া মুখ চন্দা।

গানটা ঠিক জমছে না ভেবে নক্ষত্র আরেকটা গান ধরে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

কলাবতী নক্ষত্রের ভাবসাব দেখে ফিক করে হেসে ফেলে। নক্ষত্রের সাহস বাড়ে। কলাবতীকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ওষ্ঠের উষ্ণ স্পর্শে কলাবতীর শরীরে আগুন জ্বলে। কলাবতী চোখ বুজে থাকে। বুকের ভেতরটা হাঁপরের মতো ধক ধক করছে। কলাবতী নিজেকে সঁপে দেয়। নক্ষত্র আরো কী করতো কে জানে! একটা কোলাহল ওদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে নক্ষত্র সাবধান হয়।

কৃষ্ণাদিদিরা এদিকে আসছে। কৃষ্ণাদিদির নাম আসলে নন্দিনী। বাড়িয়ার যুবারাজের সঙ্গে তার কদিন বাদে বিয়ে। ওদের এখানে দেখে কৃষ্ণাদিদি ও তার দলবল অবাক। দুজনের ভাবসাব জরিপ করতে করতে কৃষ্ণা দিদি বললো, ওমা, তোমরা এখানে কী করছো? চলো, চলো, রাধাশ্যামের বাল্যভোগের প্রসাদ নেবে চলো। ধাইমা, কখন থেকে কলিকে খুঁজছে।

বিরক্ত হয়ে নক্ষত্র বললো, বাল্যভোগের প্রসাদ তো প্রাসাদে নেওয়া হবে। তা তোমরা এখানে কি করছো?

কৃষ্ণাদিদি নক্ষত্রের কথা বলার ঢঙে আহত হলেন মনে হল। বললো, তোমাদের ডিসটার্ব করতে আসি নি। মাইদেবতা বললেন আজ ফুলের মালার প্রতিযোগিতা হবে, তাই ফুল তুলতে এসেছি। চলরে চল।

কলাবতীর এতক্ষণে হুঁশ ফিরলো। কৃষ্ণাদিদিকে বললো, চলো আমিও ফুল তুলবো, মালা গাঁথবো।

নক্ষত্র একবার কলাবতীর দিকে আগুনদৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে গেলো। তার মেজাজ বিগড়ে গেছে। ইচ্ছেপূরণ না হলে মানুষের এরকমই হয়। কলাবতী নক্ষত্রের রাগ দেখে হেসে ফেলে। মনে মনে কী শয়তানি মতলব ছিল কে জানে! কলাবতীকে দিয়ে এ সময় যা ইচ্ছে করানো যেতো। আবেগে তো সে তিনভুবন ভুলেই ছিল। কেন জানি, পৃথিবীটাকে কলাবতীর খুব সুন্দর লাগছে। মনের ভেতর খুশির তুফান উঠছে। কলাবতীর নক্ষত্রের হাত ধরে নাচতে ইচ্ছে করছে। নক্ষত্রের প্রতিটি কথা অনুভূতিতে অনুরণন তুলে তাকে বেহুঁশ করে দিয়েছে। এখন সে আর তার মধ্যে নেই। সারা শরীরে এতো পুলক আগে সে অনুভব করে নি। তার চেহারা অচেনা ঠেকছে।

এতক্ষণ কারো দিকে নজর ছিল না। কলাবতী হঠাৎ লক্ষ্য করলো কৃষ্ণা দিদি ও তার দলবল তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কী যেন দেখছে? কলাবতী লজ্জা পেলো। আনন্দ এমনই কিছুতেই লুকোনো যায় না। চোখেমুখে ফুটে ওঠে।

লালু কর্তা ত্রিপুরার মহামন্ত্রী ব্যালকনি থেকে আনমনে রাস্তার দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। রাজবাড়ির সীমানা যেখানে শেষ তার বাঁ দিকের কোণায় লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোডের ওপর তাঁর মহল। মনটা ভালো নেই। তাই লাল মোরামের রাস্তার দিকে তাকিয়ে লোকের চলাফেরা দেখছেন। আজ বুধবার। দরবার বন্ধ। ডানদিকে বেশ কিছুদূরে প্রফুল্ল কর্তা, শচীন কর্তা ও বিদুর কর্তার বাড়ি। কর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাছুয়াকে (রক্ষিতা) রানী করেছেন বলে রাজপরিবার পারত পক্ষে তাঁদের ধারে-কাছে ঘেঁষেন না। বড়ঠাকুর সমরেন্দ্র চন্দ্র বাবামহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গে সিংহাসন নিয়ে লড়তে গিয়ে নির্বাসিত হলেন। নবদ্বীপচন্দ্র লড়লেন দাদু মহারাজ বীরচন্দ্রের সঙ্গে। তাঁকেও যেতে হল বনবাসে কুমিল্লায়। তাঁর পুত্র শচীন কর্তার হালও তাই। রাজভাতা ত্যাগ করে কলিকাতায় নাকি অলিতে গলিতে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। এমন অবস্থায় তাঁর পুত্র নক্ষত্রের কি হবে? নক্ষত্রের বয়েস মাত্র আঠারো। এরমধ্যে তার জন্যে বেশ কিছু রক্ষিতার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কিন্তু তার চোখ পড়েছে বাবার বৈমাত্রেয় দাদা মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের কন্যার উপর। লালু কর্তা মনে মনে জানেন এ বিয়ে হলে রাজপরিবারে কেউ তা মেনে নেবেন না, অনর্থ হবে।

লালু কর্তা হাততালি দিলেন। দুজন পেয়াদা এসে লালু কর্তার দুপাশে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে অস্ফুটে বললো, আজ্ঞা ।

লালু কর্তা বললেন, নক্ষত্র কর্তাকে এত্তেলা দাও।

ওরা চলে গেলো।

কিছুক্ষণ বাদে নক্ষত্র এসে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে নম্র স্বরে বললো, আজ্ঞা।

লালু কর্তা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ম্যাট্রিকেব রেজাল্ট কবে বেরোচ্ছে?

নক্ষত্র বললো, একমাসের মধ্যেই বেরিয়ে যাবে আশা করি।

কি করবে মনস্থ করেছো?

নক্ষত্র বললো, আরো পড়াশোনা করার ইচ্ছে আছে।

খুব ভালো কথা। শুনে সুখী হলাম । এবার নক্ষত্রকে কাছে ডেকে আদর করে

বসিয়ে বলতে লাগলেন, রবিকাকাকে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) চিঠি লিখেছিলাম তোমার ম্যাট্রিক দেবার খবর জানিয়ে। তাঁর একান্ত ইচ্ছেতুমি শান্তি নিকেতনে পড়াশোনা কর। জানো, ওখানে এখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যা ইন্দিরা আছে। কুচবিহারের রাজকন্যা ইলাও ওখানে পড়ে। তোমার কোন অসুবিধা হবে না। তোমার তো জানার কথা, রবিকাকা আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। ইংরেজদের বাধায় আমি শান্তিনিকেতনে পড়তে যেতে পারি নি। রবিকাকার এর জন্যে অনেক দুঃখ। রবিকাকা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন করেছেন। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর নাইট উপাধি ত্যাগ করেছেন। ইংরেজরা সন্দেহের চোখে তাঁকে দেখতো বলে নেটিভ ষ্টেট-এর রাজকুমার হয়ে আমি শান্তিনিকেতনে যেতে পারি নি। তুমি আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর।

নক্ষত্র সমীহের সুরে বললো, বাবা যা আজ্ঞা করবেন তাই হবে। তারপর একটু থেমে বাবার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে বললো, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে, বাবা কি আমাকে কলাবতীর জন্যে শান্তিনিকেতনে পাঠাচ্ছেন?

লালু কর্তা হাসেন, না তোমার ইচ্ছে না হলে যাবে না। পড়াশোনা করবে বলাতে শান্তিনিকেতনের কথাই প্রথম মনে পড়লো। রবিকাকার তত্ত্বাবধানে তুমি মানুষ হয়ে ফিরবে এ কথা আমি জোরগলায় বলতে পারি। তোমার বাবাকে রবিকাকা কি চোখে দেখেন তা তো তুমি জানো — দাঁড়াও, তোমাকে তাঁর দুয়েকটা চিঠি পড়াবো। বুঝবে মানুষটা কতো বড়োমাপের আর আমাকে কতো স্নেহ করেন। পড়া হয়ে গেলেই আমাকে ফেরৎ দেবে। চিঠিগুলি আমার জীবনের পাথেয়, অমূল্য সম্পদ। হারিয়ে গেলে আমি বাঁচবো না।

লালু কর্তা উঠে ভেতরে গেলেন। নক্ষত্র তাঁর পথের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, কবিগুরুর স্নেহধন্য তাঁর বাবার ঝুলিতে এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কী হতে পারে? লালু কর্তা ফিরে এসে বললেন, এ চিঠিগুলো পড়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সভ্যতাকে জানতে পারবে।

নক্ষত্র চিঠিগুলো নিয়ে তার ঘরে চলে যান। বাবার আদেশ শিরোধার্য করে চিঠিগুলো পড়তে শুরু করেন। ২৪শে চৈত্র ১৩০৮ সালের চিঠিতে রবিঠাকুর তাঁর প্রস্তাবিত ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের আদর্শের কথা ঘোষণা করেন যা ইতিপূর্বে আর কারো কাছে ঘোষিত হয় নি—

'আমি ভারতবর্ষের ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জনে, নিরুদ্বেগে,

পবিত্র, নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই— তাহাদিগকে সর্বপ্রকার বিলাতী-বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই।'

তারপরই ভারতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে বালক রাজকুমারের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলে অপূর্ব দ্যোতনায় লিখলেন— 'তুমিও বাহিরে না হোক অন্তরে সেই দীক্ষা গ্রহণ কর। মনে দৃঢ়রূপে জান যে দারিদ্র্যে অপমান নাই, কৌপিনেও লজ্জা নাই, চৌকি,টেবিল প্রভৃতি আসবাবের অভাবে লেশমাত্র অসভ্যতা নাই। যাহারা ধনসম্পদ, বাণিজ্য-ব্যবসায়, আসবাব, আয়োজনের প্রাচুর্য্যকে সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া প্রচার করে তাহারা বর্ব্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়া স্পর্ধা করে।'

চিঠিটির পরবর্তী অংশে জীবনসাধনার পবিত্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করতে বালক রাজকুমার লালু কর্তাকে লেখেন— 'শান্তিতে, সন্তোষে, মঙ্গলে, ক্ষমায়, জ্ঞানে, ধ্যানেই-সভ্যতা। সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া, বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধনমুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও। ইংরেজ শিক্ষক তোমার এই স্বাভাবিক তেজকে ম্লান ও নির্বাপিত করিবার অনেক চেষ্টা করিবে— সেই প্রতিকূল চেষ্টায় তোমার তেজ বর্দ্ধিত হইয়া এই দুরূহ পরীক্ষা হইতে তোমাকে উত্তীর্ণ করুক। ভারতবর্ষের আশীর্বাদ তোমাকে রক্ষা করুক। বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়ো। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্মো ভয়াবহঃ।'

ইমপেরিয়্যাল ক্যাডেট কোরে লালু কর্তা যখন পড়তেন তখন তাকে অনেক চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে তিনি লিখেছেন — 'তুমি সংযত অপ্রমত্ত থাকিয়া সুন্দরভাবে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে। চতুর্দিকে ধূলিপঙ্কের মধ্যেও সুরধনীধারাস্নাত তরুণ দেবকুমারের মতো তুমি অম্লান সুন্দর নির্মলতা লইয়া নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করিতে পারিবে।'

আরেক জায়গায় লিখলেন — 'যে অবস্থায় যে সঙ্গে যে শিক্ষার মধ্যে পতিত হও না কেন ভারতবর্ষের আদর্শকে কোন মতেই হৃদয় হইতে ম্লান হইতে দিও না। ইহা নিশ্চয় মনে রাখিও য়ুরোপীয় বর্ব্বরেরা ভারতবর্ষের যথার্থ মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া উপহাস করে। সেই উপহাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়ো। তোমার শিক্ষক যদি

ভারতবর্ষকে নিন্দা করে তুমি সেই নিন্দাকে নিরুত্তরে অবজ্ঞা করিয়ো। স্তব্ধ মৌনভাবে অটল নিষ্ঠার সহিত ভারতবর্ষের নিকট একান্তচিত্তে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কর।'

চিঠিগুলি পড়তে পড়তে নক্ষত্র তার মধ্যে এক উদ্দীপনা অনুভব করে। বাবা জানেন না, ঢাকায় থাকতেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। রাজকুমার বলে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তাকে যোগ না দিতে বলা হয়। কারণ, পরোক্ষে সে তাদের অনেক সাহায্য করতে পারে। কলাবতী জানে, রাজবাড়ির কোথাও বোমা পিস্তল লুকিয়ে রাখা হয়। সঠিক জায়গা জানে না। ঝোলাসহ নক্ষত্রকে একদিন সে ধরে ফেলেছিল। উত্তরে নক্ষত্র বলেছিল,'বন্দেমাতরম্' । কলাবতী কী বুঝলো কে জানে। কোন উচ্চবাচ্য করে নি আর। তবে কাউকে কিছু না বলতে কলাবতীকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

এই তো কয়েকদিন আগের ঘটনা। অমর ভট্টাচার্যের 'অমর সুধায়' ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামী শচীন্দ্র দত্ত, পবিত্র পাল ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী। দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত আত্মগোপন করেন, পরে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী হয়ে কারারুদ্ধ হন। আগরতলার পুলিশ অফিসারের এবং সোনামুড়ার এস. ডি.ও-র পিস্তল চুরির ঘটনায় প্রভাত রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের বিভিন্ন উদ্যোগে উমেশলাল সিংহ, নলিনী সেনগুপ্ত কলিকাতায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। শচীন্দ্রলাল সিংহ এবং পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছেন। দাদা মহারাজ ও বাবা (মন্ত্রী হিসেবে) সব জানেন। ইংরেজদের পক্ষ থেকে আদেশনামা জারি না হলে নির্বিকার থাকেন।

ত্রিপুরার রাজাদের বৃটিশবিরোধী মনোভাব মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের আমল থেকে চলে আসছে। সরকারী কাজে অনাবশ্যক কারণে ইংরেজী ব্যবহার সম্পর্কে রাজ-কর্মচারীদের সতর্ক করে আদেশ জারি করেন রাধাকিশোর।

'এখানে আবহমানকাল রাজকার্যে বাঙ্গলা ভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। ইহা বঙ্গদেশীয় হিন্দু রাজার পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক মনে করি। বিশেষত যাহাতে দিন দিন উন্নত হয় তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্তব্য মনে করি। ইংরেজী-শিক্ষিত কর্মচারীবর্গের রাজ্যের এই চিরপোষিত উদ্দেশ্য ও নিয়ম ব্যর্থ না হয় সে বিষয়ে আপনি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।'

মিলন সংঘ, মাতৃসংঘ আসলে স্বদেশী বিপ্লবীদের আখড়া। দিনের বেলায় শরীরচর্চা, সংস্কৃতিচর্চা হয় কিন্তু রাতের বেলা ওখানে লাঠি খেলা, অস্ত্রশিক্ষা দেয়া

হয়। বাইরে থেকে আসা স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কৃষক সেজে উদয়পুর এবং বিলনীয়ার খামারে থাকেন। দিনের বেলায় গামছা পরে ক্ষেতের কাজ করেন, রাতের বেলায় স্থানীয় লোকদের স্বাধীনতার দীক্ষায় দীক্ষিত করে বোমা বানানো এবং পিস্তল চালানো শেখানো হয়। আগরতলার অনুশীলন সমিতির উপর কড়া নজর রাখতে আদেশ জারি হয়েছে।

স্বাধীন ত্রিপুরায় এই যে বৈপ্লবিক কাণ্ডকারখানা তার পেছনে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অনেক। ঠাকুর বোর্ডিং-এর ছেলেদের তিনি স্বাধীন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, কৃষ্টি, সংস্কৃতির কথা বলে উদ্দীপ্ত করতেন। যেমন তাঁর চিঠিগুলি পড়ে এই মুহূর্তে নক্ষত্র নিজেকে আর রাজকুমার ভাবছেন না, ভাবছেন ভারতের ঐতিহ্যের ধারক। তারও কিছু করার আছে। বাবা ঠিকই বলেছেন, তাকে শান্তিনিকেতনে যেতে হবে। রবীন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বসে ভারতীয় ঐতিহ্যের পাঠ নেবেন। ত্রিপুরার সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির কোন অমিল নেই। কড়গুনতি খৃষ্টানও নেই ত্রিপুরায়। কাজেই বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রশ্নই ওঠে না।

এই সব চিন্তাভাবনা নক্ষত্রকে উদ্দীপিত করে। ভারতবর্ষকে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত করতে হবে। তার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে সে প্রস্তুত। কলাবতীও জানে সে বন্দেমাতরমের ভক্ত। ভাবনার রাজ্যে কলাবতী আবার উঁকি দিতে নক্ষত্র সাবধান হল। কলাবতী তার সব ভাবনায় জড়িয়ে আছে নাকি?

রাজপ্রাসাদে আজ সাজ সাজ রব। গোয়ালিয়রের মহারাজার ছোটভাই রাজকুমার কেশব রাও সিন্ধিয়া আসছেন কলাবতীকে দেখতে। বিয়ের সম্বন্ধ এনেছেন মেজদা দুর্জয় কর্তা। মহারাজা বীরবিক্রম তাঁর সম্মতি জানিয়েছেন। মহারানী কাঞ্চনপ্রভার তদারকিতে হলঘর, ডাইনিং হল, ফুল এবং বিচিত্র কাপড়ের বিভিন্ন কারুকাজে সুসজ্জিত করা হয়েছে। ফুলের গন্ধে অন্দরমহল ম ম। মণিপুরী চাদর, আতরদান, ফুল, চন্দন, ধূপ-দীপ সাজিয়ে রাখা হয়েছে ভাবী বর ও তাঁর সাথীদের স্বাগত জানাবার জন্যে। পঞ্চাশটি সুসজ্জিত হাতি, সৈন্য, বরকন্দাজ এবং লোক-লস্কর নিয়ে দুর্জয় কর্তা আখাউড়া স্টেশনে গেছেন। প্রজারাও থাকবে। অন্দরমহলে বরপক্ষের অভ্যর্থনায় যেন কোন ত্রুটি না হয় তার খুঁটিনাটি দেখছেন মহারাজা বীরবিক্রম স্বয়ং। দরবারের পরিচ্ছদে সবাই সেজেছেন। মাথায় পাগড়ী, ব্রোকেডের আচকান, চোস্ত পায়জামা, নাগরা জুতো, কটিবন্ধে তলোয়ার। মেয়েদের দিকে তাকানা যায় না। হীরা মাণিক্যের ছটায় চোখ ঝলসে যায়। শাড়ীতেও সোনা রুপোর জরির ছটা।

কৃষ্ণাদিদি ওরফে নন্দিনী দেবীর উপর কলাবতীকে সাজানোর ভার পড়েছে। কলাবতী মুখ গোমড়া করে বসে আছেন দেখে নন্দিনী বললেন, একবার আয়নায় নিজের মুখটা দেখবি ভাই?

কলাবতী ঘাড় গুঁজে বসে রইলেন।

নন্দিনী বললেন, তুই কতো সুন্দর তা তুই জানিস?

নির্বিকার উত্তর দেন কলাবতী, জেনে কি লাভ?

নন্দিনী হেসে বলেন, ওমা এ কি কথা! তোকে আজ সাতসমুদ্দর তেরোনদীর পার থেকে রাজপুত্র দেখতে আসছেন যে।

কলাবতীর চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। কাঁদো কাঁদো স্বরে কলাবতী বলেন, আমাকে তোমরা বিদেয় করতে চাও, তাই না? আমাকে বিদেয় করতে পারলে তোমরা সবাই বাঁচো। রাজপরিবারে অনাসৃষ্টি হবে না। কিন্তু দিদি, এ বিয়ে হলে যে আমি বাঁচবো না।

নন্দিনী ধমক দেন, একি অলক্ষুণে কথা! তুই যাতে সুখে থাকিস তারই ব্যবস্থা হচ্ছে।

না গো দিদি, না, তোমরা বুঝতে চাইছো না, এ বিয়ে হলে নক্ষত্র বিবাগী হবে, আমিও বাঁচবো না।

এবার কঠিন স্বরে বলেন নন্দিনী, রাজকুমারী হয়ে তুই লোক হাসাতে চাস? আমাদের মানমর্যাদা, রাজপরিবারের ঐতিহ্য সব ভুলে গেছিস? আমারও তো বিয়ে হচ্ছে বাড়িয়ার যুবরাজের সঙ্গে, যে আমার চেয়ে কুড়ি বছরের বড়। আমি কি অমত করেছি? রাজপরিবারের সম্মানরক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের। অবুঝ হোস না বোন! রাজপরিবারের ইতিহাসই যে আত্মত্যাগের ইতিহাস। তুই তার ব্যতিক্রম হবি কী করে?

মাথা ঝাঁকিয়ে কলাবতী বলেন, এমন সব কথা বলবো, দেখবে রাজপুত্র পালাবার পথ পাবে না।

নন্দিনী গম্ভীর মুখে বলেন, এমন কিছু কোরো না যাতে দাদা মহারাজের মান যায়।

এমন সময় দুম দুম্ করে একশো একটা তোপের আওয়াজ হল। আখাউরা রেলষ্টেশন রাজপ্রাসাদ থেকে চার মাইল দূরে। আগরতলা শহরের বাসিন্দা মাত্র কয়েক হাজার। চারদিক ফাঁকা ফাঁকা। রাস্তার দুধারের কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শিরীষ, পলাশ মাথা নুইয়ে তোপের আওয়াজে হাওয়ায় মস্তক নত করে। মাহুতরা পঞ্চাশটি হাতিকে আদেশ করে —বৈঠ! হাতিরা সব পা মুড়ে বসে যায়। সবার প্রথমে সোনা রুপোর ঝালর দিয়ে সাজানো যে হাতি তাতে কেশব রাও ও দুর্জয়কর্তা বসলেন। সাঙ্গ-পাঙ্গরা অন্য হাতিতে। সদু মিঞার নাগাচী ব্যাণ্ডপার্টি বাদ্যঝঙ্কার তুলে আগে আগে চলে। ছেলে আলাউদ্দিন আসে নি। মেহের কালীবাড়িতে নাকি আজ তার মানত আছে। মহারাজকুমার কেশব রাওকে অত্যন্ত প্রীত দেখাচ্ছে। জয়ধ্বনির সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রত্যভিবাদন করছেন। রাস্তার দুপাশ থেকে অসংখ্য ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ছে কেশর রাওয়ের হাওদায়। ব্যাণ্ডপার্টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাতিগুলি চলছে হেলে দুলে। আতসবাজি ও পটকার আওয়াজ বিরক্তি উৎপাদন করছে তাদের। চালচলনে বোঝা যায়।

সিংহদ্বারে পৌঁছে কেশর রাওয়ের মুখে অবাকচিহ্ন ফুটে ওঠে। এতোবড়ো এতো সুন্দর ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদ স্বপ্নেও ভাবেন নি তিনি। ধনকুবের গোয়ালিয়র রাজপরিবারের ঘরানার তুলনায় ত্রিপুরাকে একটি অতি দরিদ্র সামান্য দেশীয় রাজ্য ভেবেছিলেন। মনে মনে একটা আত্মাভিমান ছিল, যেন দয়া করে এক পাহাড়ী রাজকুমারীকে দেখতে এসেছেন। পছন্দ হবে না ধরে নিয়েই এসেছেন কৌতূহলবশে।

রাজবাড়ির সিঁড়ির সামনে এসে মিছিল থামল। কেশব রাও ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা হাতি থেকে নামলেন। দুর্জয় কর্তা তাঁদের লাটমহলে নিয়ে গিয়ে বললেন, রাস্তায় অনেক ধকল গেছে। আপনারা একটু বিশ্রাম করুন। আমি একঘন্টা বাদে আপনাদের অন্দরমহলে নিয়ে যাবার ইচ্ছে রাখি, আপনারা দয়া করে সেইমতো প্রস্তুত থাকবেন। এই বলে দুর্জয় কর্তা চলে গেলেন, কারণ দাদামহারাজকে খবর দেওয়া জরুরি অতিথিরা এসে গেছেন।

অন্দরমহলে এসে দুর্জয় কর্তা জানলেন, মহারাজা বীরবিক্রম মন্ত্রীপরিষদসহ মন্ত্রণা কক্ষে আছেন। এ সময় তো মহারাজার মন্ত্রণাকক্ষে থাকার কথা নয়, বোনের বিয়ে নিয়েই তো তৎপর ছিলেন। খবর নিয়ে জানলেন, পাহাড়ের সর্দাররা সব একজোট হয়ে এসেছে মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে। মহারাজা সময় দিয়েছেন, কারণ সন্ধের পর পাহাড়ে ফিরে যেতে তাদের কষ্ট হবে।

মন্ত্রণাকক্ষে তখন পাহাড়ী সর্দারদের সঙ্গে মহারাজা বীরবিক্রমের কথোপকথন শেষ পর্বে পৌঁছেছে। সর্দার জয়ন্ত জমাতিয়া বলছে, মাইবাপ মহারাজের অনুগ্রহে এতাবৎকাল আমরা জুমচাষ করে আসছি, মহারাজ যেন আমাদের হালচাষে বাধ্য না করেন। আমাদের পিতা-প্রপিতামহ কোনদিন হালচাষ করেন নি, আমরা পারবো না হুজুর মাই বাপ! মহারাজার আদেশ শিরোধার্য কিন্তু আমাদের অক্ষমতাও বিবেচনাযোগ্য।

বীরবিক্রম বললেন, আমি তোমাদের জন্যে জমি সংরক্ষিত রেখেছি। জমি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছি। এতে তোমাদের মঙ্গল হবে। তোমরা পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসো। সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা প্রদান করো। শিক্ষার আলোক ছাড়া কোন জাতির উন্নতি হয় না। তাছাড়া জঙ্গল কেটে তোমরা পরিবেশ দূষিত করছো, এ ভবিষ্যতের পক্ষে অমঙ্গলকর।

সর্দার বুধু দেববর্মা জয়ন্ত জমাতিয়ার কানে কানে কী যেন বললো। জয়ন্ত জমাতিয়া হাতজোড় করে বললো, মহারাজের হুকুম হোক আমাদের কিছু সময় ভিক্ষা দিতে। শলা পরামর্শ করে আমাদের মনের কথা মহারাজকে নিবেদন করা হবে।

মহারাজা বীরবিক্রম তথাস্তু-র ভঙ্গিতে মন্ত্রণাকক্ষ ত্যাগ করলেন। পেছনে মন্ত্রী লালু কর্তা এবং অন্য পারিষদরা।

দুর্জয় কর্তা মন্ত্রণাকক্ষের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। মহারাজা বীরবিক্রম বেরোতেই 'দাদা মহারাজ হালাম' (প্রণাম) বলে মাথা নুইয়ে বললেন, অতিথিরা সব এসে গেছেন। তাঁদের অন্দরমহলের হলঘরে নিয়ে আসার আজ্ঞা হোক।

ঠিক আছে। বীরবিক্রম বললেন, আধঘন্টা পরে আমি হলঘরে থাকবো। তুমি

সেইমতো সবাইকে বলে সব বন্দোবস্ত কর।

হলঘরে সবাই একত্রিত হয়েছেন। একটা সিংহাসনে রাজকুমার কেশব রাও বসেছেন। তাঁর পাশের সিংহাসন খালি। ওখানে মহারাজকুমারী কলাবতী এসে বসবেন। তার আগে পরিচিতির পালা। দুর্জয় কর্তা মহারাজা বীরবিক্রম, মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী এবং সমবেত রাজপরিবারের সঙ্গে অতিথিদের পরিচয় করালেন। রাজকুমার কেশব রাও তাঁর সঙ্গীসাথীদের বংশগত ও গুণগত পরিচয় দিলেন। পরিচয়ের পালা অভিবাদন এবং প্রত্যভিবাদনে সাঙ্গ হল।

কেশব রাও কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে নমস্কার করে বললেন, শুনলাম মহারানী পান্নার রাজকুমারী। মহারানী তো তাহলে আমাদের প্রদেশের লোক হয়ে গেলেন।

কাঞ্চনপ্রভা কৌতুক করে বললেন, আমি মধ্যপ্রদেশের বাঘের রাজ্য পান্নার রাজকুমারী আর নই, আমি এখন ত্রিপুরার পাটরানী মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী।

কথা শুনে সবাই নীরবে হাসলেন।

কাঞ্চনপ্রভার সঙ্গে মহারাজা বীরবিক্রমের বিবাহের বয়স মাত্র দু'বছর। কাঞ্চনপ্রভার বয়েস এখন একুশ, মহারাজের চব্বিশ। কেশব রাওয়ের বয়েসও বছর কুড়ি হবে। শ্যামলা রঙ, দেখতে এমন কিছু আহামরি নন। মুখ দেখে কাঞ্চনপ্রভার বর পছন্দ হয়েছে বলে মনে হল না। ধনী রাজা বটে, কিন্তু ধনই তো জীবনের পরম প্রাপ্তি নয়। কলাবতীর রূপ যেমন গুণ ততোধিক। এমন রূপবতী গুণবতী কন্যার কদর দিতে জহুরী হতে হবে। একটু যাচাই করে নিলে কেমন হয়?

কাঞ্চনপ্রভা বললেন, মহারাজা অনুমতি দিলে রাজকুমার কেশব রাওজীকে দুয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি।

মহারাজা বীরবিক্রম বললেন, না, মহারানীর জ্ঞাতার্থে জানাই, কন্যা পছন্দের পরই প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নে কোন বাধা নেই।

এবার দুর্জয় কর্তা বললেন, কন্যাকে আনতে মহারাজের আজ্ঞা হোক।

রুনুঝুনু নূপুরের মিষ্টি আওয়াজ তুলে কৃষ্ণাদিদির হাত ধরে সপ্তদশী কলাবতী হলঘরে আনতমুখে প্রবেশ করলেন। তার রূপের বিভায় সবার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। কেশব রাওজীর চোখের পলক পড়ছে না। ঘরে সূঁচ পড়লে আওয়াজ হবে এমন নিস্তব্ধতা। মহারাজা বীরবিক্রমও মনে মনে কলাবতীর সৌন্দর্যের তারিফ করলেন। নক্ষত্র কেন কলাবতীর প্রেমে পড়েছে তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে তাঁর বিন্দুমাত্র সময়ের অভাব হল না। মনকে শক্ত করলেন। এমন চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই।

কলাবতী কেশব রাওয়ের পাশের সিংহাসনে লজ্জাবনত মুখে বসে রইলেন। বরের বোন অমিতারানী উঠে এসে কলাবতীর মুখটা তুলে ধরে বললেন, বারে, মুখ নামিয়ে বসে থাকলে এমন সুন্দর মুখটা দেখবো কি করে?

কলাবতী চোখ তুলে তাকাতে মনে হল সবার চোখে বিদ্যুৎ খেলছে। আসলে কলাবতীর চোখের তারার বিদ্যুৎ-তরঙ্গে সবাই তড়িতাহত হয়েছেন। কারো মুখে কথা নেই। সবাই কথা বলতে ভুলে গেছেন।

নীরবতা ভঙ্গ করে মাতামহারানী জীবনকুমারীদেবী বললেন, রাজকুমারের আমার রাজকুমারী কলাবতীকে পছন্দ হয়েছে কি?

কেশব রাও উত্তর দেবার অবস্থায় ছিলেন না। যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন। জীবনকুমারীদেবীর প্রশ্নও ঠিক শুনতে পাননি। বরপক্ষের সবাই হাত তুলে বললেন, পছন্দ! পছন্দ!

কথাদুটি হলঘরের গম্বুজে আঘাত করে কলাবতীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করল। কলাবতীর কোন ভাবান্তর দেখা গেলো না। কৃষ্ণাদিদি এসে কলাবতীকে নিয়ে গেলেন। এখন মহারাজের সঙ্গে বরপক্ষের বিয়ের সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক আলোচনা হবে।

যদিও আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই, তবুও চেষ্টা করবো। বলুন, কী জানতে চান? কলাবতী সরাসরি জিজ্ঞেস করেন।

কলাবতী দেখলেন, কেশব রাও তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন।

আমার তেমন কোন প্রশ্ন নেই। আমি তোমার মতামত জানতে চাই। আমার তোমাকে পছন্দ হয়েছে কিন্তু তোমার হয়েছে কিনা তা তো জানা হল না।

দাদামহারাজের পছন্দই আমার পছন্দ। আমার ব্যক্তিগত কোন পছন্দ নেই। কলাবতী গাম্ভীর্যসহকারে বললেন।

কেশব রাও তার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। কী বুঝলেন বোঝা গেলো না।

খুব সন্তর্পণে বললেন, তোমার দাদা মহারাজের কথা বোঝা অসাধ্য। একবার বলছেন বিয়ে হবে ত্রিপুরায় আবার বলছেন কলিকাতায় না হয় বেনারস— আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এর চেয়ে বরং আমার রাজ্যে তোমার মেজদাদা সম্প্রদান করুক। আমার প্রজারা খুশি হবে। আমাদের বিয়ে আমার রাজ্যেই হোক, তুমি কি বল?

অপমানিত ও অস্বস্তি বোধ করে চুপ করে রইলেন কলাবতী।

তাকে কিছু না বলতে দেখে কেশব রাও বললেন, চুপ করে থাকবে নাকি? তুমি কি পুতুল?

কলাবতী দৃঢ়স্বরে বললেন, হ্যাঁ আমি পুতুল। দাদা যা বলবেন তাই হবে। আমার সঙ্গে আপনার বিয়ের ইচ্ছে থাকলে আপনার দাদাকে বলবেন ভেবেচিন্তে আপনাদের মতামত জানিয়ে পত্র লিখতে।

কেশব রাওয়ের চোখে-মুখে অসন্তুষ্টির ছাপ। চেহারা দেখে মনে হয় অপমানিত বোধ করেছেন।

ঠিক আছে দেখা যাবে, বলে আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন।

কেশব রাও চলে যেতে কলাবতীর মনে হল কাজটা ঠিক করলেন না। মা জানলে বিরক্ত হবেন। মেজদাদা দুর্জয় কর্তা তাকে ক্ষমা করবেন না। দাদা মহারাজ জানলে কি হবে ভাবতেও শিহরিত হলেন। ঠিক করলেন, কাউকে কিছু বলার কী দায়?

আজ কৃষ্ণাদিদির বিয়ে।

দিদি তার টানা টানা চোখে কাজল পরেছে, কপালে টিপ। লাল ঘাগরায় তাকে অপরূপ দেখাচ্ছে। পিসিমাদের সময়ে নাকি সাদা ধবধবে পাতলা কাপড়ে রুপালী বুটি দেওয়া দুবরা পরা হতো বিয়েতে, নেটের চাদর সাদা বুটিদারে ঝক ঝক করত।

কৃষ্ণাদিদির চাদরে সবুজ বর্ডার, চুমকি সলমায় কাজ করা লাল চাদর ভরাট বুকের উচ্চতার মাপ হিসেবে বেশ মানিয়েছে। সোনালী ঘাগরায় কৃষ্ণাদিদির শরীরে আগুন জ্বলছে। হাতে বাউটি, গলায় চম্পাকলি, আরো নানা চমকদার কণ্ঠহার। বাহুতে জড়োয়া, জোড়া কবচ, বাজুবন্দ। কানে চমায়, সিঁথিতে হীরের টিকাবন্দি, কপালের চূর্ণকেশে জোনাকীর দ্যুতি জ্বলছে। ফুলের লটকন কানের পাশ দিয়ে লাউডগার মতো দুলছে। পায়ের সোনার নূপুর অযথা বাজছে তো বাজছেই। ফুলমালা, সেন্টের মিষ্টি সুবাস মিশিয়ে কৃষ্ণাদিদিকে ঘিরে এক মোহের আবরণ সৃষ্টি করেছে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল কলাবতী।

সানাই বাজলো, আজ তা খেলাঘরে নয়, সশরীরে মুন্না খাঁ-ই বাজালেন।

হাওদায় বসে বর এলেন হাতির পিঠে। দীর্ঘ মিছিল এল। বাজলো ব্যান্ড, ব্যাগপাইপ। পুতুল-বিয়েতে যা যা হতো সবই হল, আয়াজু বরণ করলো বরকে। গোধূলীর শুভ লগ্নে শুভদৃষ্টি, মালাবদল হল। কনে বিদায়ের দিনে ভাই-বোন সবাই কাঁদলো— যেমন করে পুতুল খেলায় সবাই কেঁদেছিল।

কৃষ্ণাদিদির ধুমধাম জাঁকজমক করে বিয়ে হয়ে গেলো বাড়িয়ার যুবরাজের সঙ্গে। কৃষ্ণাদিদি কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেন। ছেলেবেলায় কৃষ্ণাদিদির সঙ্গে ঝগড়ার কথা মনে করে কলাবতীও কম কাঁদলেন না।

কৃষ্ণাদিদি চলে যাবার পরই কলাবতীর ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেলো। কলাবতীর জলবসন্ত হল। খবরটা কি ভাবে গোয়ালিয়রে পৌঁছে গেছে। পাকাপাকি বিয়ে ঠিক হওয়ার পর বিয়ে ভেঙ্গে গেলো। দাদা মহারাজ ব্যথিত হলেন। গণ্যমান্য রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে হয়নি বলে কলাবতীর কোন আপশোস নেই। ঐ রাজাকে তার মনেও ধরে

নি। সহজেই ভুলে যেতেন কিন্তু খুব বড় আঘাত পেলেন যখন জানলেন, মেজদা দুর্জয় কর্তার মনোনীত পাত্রীকে ঐ রাজা তাঁর নিজের রাজ্যে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছেন। মেজদার এই কাজকে গর্হিত ভেবে সমর্থন করতে পারলেন না কলাবতী। রাজপরিবারের অন্যান্যরা কী করে মেনে নিলেন এ অপমান, বোধগম্য হল না তার।

নক্ষত্র শান্তিনিকেতনে চলে গেছেন। নিরানন্দ অবস্থায় আগরতলায় থাকতে আর তার মন চাইছিল না। কলাবতী বায়না ধরে কলকাতায় চলে এলেন। ত্রিপুরার রাজবাড়িতে। বিরাট চত্বর নিয়ে ত্রিপুরার রাজবাড়ি। এখানেই কয়েকবার দেখা হয়েছে রাজাসাব বীরেন্দ্রের সঙ্গে। তাঁর মাসতুতো বোনেরা বীরেন্দ্রের সাথে বেড়াতে যেতেন। ছোটদিদি বীণাকুমারীও তখন কলিকাতায় ছিলেন। তিনিও যেতেন। ছোটদিদি কলাবতীকে জোর জবরদস্তি করে ওঁদের সঙ্গে যেতে বাধ্য করতেন।

বীরেন্দ্র তার অনিচ্ছা দেখে একদিন বললেন, আমার এমন কি অপরাধ আমার সঙ্গে কথা বলতে নেই, বেড়াতে যেতে নেই?

কলাবতী বললেন, আমার মন ভালো না।

বীরেন্দ্র বললেন, মনের কি দোষ? আপনার উপর দিয়ে যে ঝড়ঝাপটা গেলো? আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি মল্লিকাভাবী ও শিবদাজীর কাছে। শিবদাজীর মতো আমিও আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আপনার বিয়ে না হওয়ার কারণও জানি।

কলাবতী এবার হেসে ফেললেন।

কৌতুক করে বললেন, কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলানো উচিৎ নয়। শিবের কথা বললেন না? শিবকে আমি ভালো চিনি না, দুয়েকবার দেখেছি মাত্র। তবে তাঁর দাদাকে খুব ভালোভাবে চিনি। তাঁদের বোন আপনার মামার মেয়ে সুলক্ষণা আমার বান্ধবী, বুঝলেন?

রাজাসাব বললেন, আপনি আমার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছেন, না? মল্লিকাভাবীর কাছেও আমি আপনার অনেক কথা শুনেছি। আপনার সৌন্দর্য, শিল্পচর্চা, আপনার অহংকার সবটাই আমার ভালো লাগে।

কলাবতী স্মিত মুখে বললেন, আপনাকেও আমার ভালো লাগে।

অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করেন রাজাসাব, বিয়েতে তবে অমত কেন?

হাসতে হাসতে বললেন কলাবতী, আপনি আমাদের দাদা মহারাজের মামাতো ·

ভাই না? এ জন্যই অমত।

এমন সময় মল্লিকা এলেন। মল্লিকা রাজাসাব বীরেন্দ্রর ভাবী। বীরেন্দ্র নেপালের রাজা ত্রিভুবনের কনিষ্ঠভ্রাতা। কলাবতী কলিকাতায় এসেছেন জানতে পারলে বীরেন্দ্রকে রোখা যেতো না। তিনিও কলিকাতায় চলে আসতেন। ত্রিপুরার মেয়েদের প্রতি মোহ তাঁর সারাজীবনেও কাটে নি। তাঁর মুগ্ধদৃষ্টি, প্রাণখোলা হাসি ও প্রিয় ব্যবহারের কথা মনে করে কলাবতী তার সংলাপকে পরিবর্তিত রূপ দিলেন। দুঃখিত বিবশ বীরেন্দ্রকে সান্ত্বনা দিতে বললেন, আমার কথায় দুঃখ পাবেন না। আসলে আমিই আপনার যোগ্যা নই। বাইরে থেকে দেখে মানুষকে চেনা যায় না রাজা সাহেব। তা ছাড়া আপনি তো সবই জানেন। নক্ষত্রকে ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রাজাসাব দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে, ঠিক আছে- বলে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

রাজাসাব চলে যেতেই মল্লিকাদি কলাবতীকে তোষামোদ শুরু করলেন। বললেন, আড়াল থেকে আমি সব শুনেছি, কলি, তুই ওকে বিয়ে কর। জানিস, ও বলে, আমি নাকি একটু তোর মতো তাই আমাকে সে অতো ভালোবাসে।

কলাবতী রাগের ভান করে বলেন, তোদের পীরিতির কথা ঢাক পিটিয়ে না শোনালে নয়?

এবার মল্লিকাদি কলাবতীর হাত চেপে ধরে অনুনয়ের সুরে বলেন, প্লিজ কলি, তুই বীরেন্দ্রকে বিয়ে কর। ও তোর জন্য সব করতে প্রস্তুত।

কথা শুনে হেসে ফেলেন কলাবতী। বলেন, ঐ চার ছেলেমেয়ের বাপকে আমি বিয়ে করবো কেন? তাঁর স্ত্রীদের কথাও চিন্তা কর।

মল্লিকা বললেন, রাজাসাব সব স্ত্রীকেই সমান ভালোবাসেন, সম্মান করেন। তোকে আমাকে সবাইকে? আমি তোর সব কথা বলে দিয়েছি, তবু আশা করেন।

কলাবতী বলেন, তুই তাঁর মনের আধখানা দখল করে আছিস, আবার দূতীয়ালি কেন?

অস্ফুটে বলেন মল্লিকা, ও খুশি হবে।

কলাবতী তাঁর কথায় আশ্চর্য হন। ছোট বোনের সাথে প্রেমিকপুরুষকে ভাগ করে নিতে মল্লিকাদিদির কোন আপত্তি নেই! জন্ম থেকে ভাগাভাগি দেখে এটাই স্বাভাবিক মনে করেন। রাজকুমারীদের কপাল এমনই, নতুবা ভালোবাসার জনকে কেউ ভাগ করতে চায়? পাটরানী মহারানীরা তো আছেনই, তার ওপর আছে এক দঙ্গল সেবাদাসী

বা রক্ষিতার পাল। একজনকে সময় দেওয়া যায়, কিন্তু এতোজনকে ভাগ ভাগ করে সময় দিলে কার ভাগ্যে কতোটা সময় পড়ে তা গুনতিতে ধরা পড়ে। কলাবতীর নিজেরও তো এ বেড়াজাল কাটাবার সাধ্য নেই। যদি ভাগ্যে থাকে, তাকেও তো নক্ষত্রকে ভাগ করে নিতে হবে। কলাবতী স্বেচ্ছাচারে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু স্বাধিকারে বিশ্বাস করেন। রাজরোষ তাকে টলাতে পারেনি। বিয়ের মিছিল যখন অর্দ্ধপথে এসে ফিরে গেলো তার জীবনের গতিও অন্য মোড় নিলো। সবাইকে দেখে কলাবতী স্থির করলেন, অসহায় জীবন তিনি বরদাস্ত করবেন না। একজন পুরুষকে দিদির সঙ্গে ভাগ করতে দিদির আপত্তি না থাকতে পারে, তার আছে।

স্থান আম্রকুঞ্জ। শান্তিনিকেতন।

নক্ষত্র, তোমার পড়াশোনায় একদম মন নেই।

তোমার বুঝি আছে?

আছেই তো। রেজাল্ট দেখো।

আমার পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না।

কি ভালো লাগে তাহলে?

এসরাজ বাজাতে, বাঁশী বাজাতে। জানো, তবলাও আমি খুব ভালো বাজাই।

যা বললে তা সত্য নয়। তোমার কি ভালো লাগে বলবো? তোমার সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে ভালো লাগে।

নক্ষত্র হা হা করে হাসেন।

ধরেছো ঠিক।

মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অতো সোজা নয় নক্ষত্র।

ফাঁকি দিতে কে চায় বলো?

আমি তো চাই পড়ার বইয়ের মতো এক এক পাতা ধরে তুমি আমাকে পড়ো।

জানো, প্রেম কি বস্তু?

সাবধান কর্তা, দু নৌকোয় পা দিও না, জলে পড়বে।

মানে?

মানে, ইলাকে ডাকবো? বলবো, তোমার প্রেমিকের রকম সকম সুবিধের নয়। আমার দিকে হাত বাড়াচ্ছে।

নক্ষত্র ইন্দিরার কথায় আমল দিলো না। নারীসঙ্গ তার কাছে নতুন কিছু নয়। অল্প বয়স থেকেই সে নারীসঙ্গে অভ্যস্ত। ইন্দিরা নেহেরুর ক্ষেত্রে তার মনে সম্ভ্রম এবং ভালোবাসা দুটোই কাজ করে। ইন্দিরাও তাকে ভালোবাসে তা সে জানে। ইন্দিরার ব্যক্তিত্ব, ধীশক্তি তাকে চুম্বকের মতো টানে। ইন্দিরার সঙ্গ তার ভালো লাগে। সাহচর্য চায়। ইন্দিরার কথা বলার ধরনই আলাদা। প্রখর বুদ্ধিমতী। নইলে কি পণ্ডিত জওহর

লাল নেহেরু জেল থেকে ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া লিখে মেয়েকে পড়তে পাঠাতেন?

নক্ষত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে ইন্দিরা বোঝার চেষ্টা করেন। নক্ষত্র কি তাঁর কথায় আহত হয়েছে? সত্যি সুপুরুষ নক্ষত্র। অনেক মানুষের মিছিলেও তাঁকে আলাদা করে চেনা যায়। অমন টকটকে আপেলের মতো গায়ের রং সচরাচর চোখে পড়ে না। গ্রীক ভাস্কর্যের মতো মুখের আদল। ইন্দিরা জানেন, শান্তিনিকেতনের প্রতিটি মেয়ে তাঁর একটু প্রেমদৃষ্টি পেলে নিজেকে ধন্য মনে করে। ইন্দিরার কেন যেন মনে হয় নক্ষত্র এখনো নাবালক। অতিমাত্রায় সরল। সাংসারিক বুদ্ধি কম। বুঝে না বুঝে মনের কথা ফট ফট করে বলে দেন। লোকে ভুল বোঝে। তবে ব্যবহার তাঁর রাজার ছেলের মতো। গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হলে, 'বন্দেমাতরম' বলে মাথাটা একটু নিচু করে জাপানীদের মতো। ত্রিপুরার রাজপরিবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন না। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তা জানেন। গুরুদেব ভুল বোঝেন না। কিন্তু আর পাঁচজন ভাবে নক্ষত্র একটি উদ্ধত চরিত্র।

ইন্দিরা সন্ধি করেন। বলেন, ইলার কথা এমনি বলছিলাম। তুমি কি রাগ করেছো?

নক্ষত্র হাসতে হাসতে বলেন, রাগ করবো কেন? তবে একটা কথা বলি ইন্দু, তোমার প্রেমে পড়েছি জানলেও ইলার কোন ভাবান্তর হবে না।

ইন্দিরা অবাক হয়ে বলেন, এ কি বলছো তুমি? ইলা রাগ করবে না?

না রাগ করবে না, নৈর্ব্যক্তিক স্বরে বলেন নক্ষত্র, রাগ করবে না কারণ ইলা কুচবিহারের রাজকন্যা। তুমি কি জানো, মহারাজাদের কতো রানী এবং রক্ষিতা থাকে? রাজপরিবারের মেয়েরা হামেশাই এসব দেখে একেই স্বাভাবিক ভাবেন। কাজেই ইলার দিক থেকে আমার কোন ভয় নেই। কারণ, ভাগ করে খেতেই সে অভ্যস্ত। তুমিও তো একটা খানদানী পরিবার থেকে এসেছো যেখানে অনেক কিছুই করা হয়, তবে সমাজকে লুকিয়ে। আমি জানি, তোমার ঠাকুর্দা মতিলাল নেহেরু একজন রহিস ব্যক্তি। প্যারিস থেকে তাঁর কাপড় ধুয়ে ইস্ত্রি হয়ে আসতো। তুমি কি ভাবো তিনি এনজয় করেন নি? রাজপরিবারে যা স্বাভাবিক বলে ধরা হয় তা বাইরের সমাজে অনাচার। লুকিয়ে করে বলে চরিত্র তো আর বদলে যাবে না? আমরা যা খোলাখুলি করি, অন্যেরা তা লুকিয়ে করে। ধরা পড়লে সমাজের চোখে হেয় হয়। আমাদের হারাবার কিছু নেই কারণ সব ব্যাপারটাই খোলামেলা। অন্যায়বোধ তাই কাজ করে না। জীবনে যে আসে সব জেনে শুনেই আসে।

ইন্দিরা খুব মন দিয়ে নক্ষত্রের কথা শুনছিলেন। নক্ষত্র তাঁর দিকে তাকাতে বললেন,

তার মানে ত্রিপুরা রাজপরিবারে নারীর কোন সম্মান নেই?

না না, নক্ষত্র বাধা দেন। একদম ভুল। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় আসলে তা নয়। ত্রিপুরী সমাজে নারীর স্থান অনেক উঁচুতে। মেয়ের ইচ্ছে না থাকলে বাবা-মা তার বিয়ে দিতে পারেন না। মেয়েরা জুমে কাজ করে আবার সংসারও সামলায়। কর্তৃত্বের চাবি তাদের হাতে। ত্রিপুরী সমাজে নারীর সম্মান নেই বলছো? পৃথিবীর কোন রাজ্যের মুদ্রায় মহারানীর নাম থাকে না। ত্রিপুরার মুদ্রায় মহারানী বা একাধিক রানীর সঙ্গে রাজার নাম যুক্ত হয়। মহারানী মহাদেবীর গল্প বলি শোন, মহারাজ মহামাণিক্য মেহেরকুল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করলে গৌড়ের সুলতানের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ শুরু হয়। বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে গৌড়েশ্বর ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। মহারাজ মহামাণিক্য ভীত হয়ে আত্মসমর্পণের উদ্যোগ নেন। তা দেখে মহারানী মহাদেবী রাজাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, মেয়েদের মতো ঘোমটা পরে ঘরে বসে থাকো। আমি যুদ্ধ করবো। ত্রিপুরার সেনাবাহিনীকে তিনি যুদ্ধে উৎসাহিত করেন এবং নিজে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বীরাঙ্গনা মহাদেবী যুদ্ধে ঘায়েল হয়েছেন ঠিকই কিন্তু যুদ্ধ জয় করে ফিরেছেন। এমন অনেক ঘটনা ত্রিপুরার রাজমালায় আছে কিন্তু নারীকে অসম্মান করা হয়েছে, এমন ঘটনার উল্লেখ নেই।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলেন ইন্দিরা। নক্ষত্রকে যেন কথা-বলার ভূতে পেয়েছে। নক্ষত্র বলতে লাগলেন, রাজকুমার বলে তুমি ভাবো আমরা মেয়েদের শরীর নিয়ে খেলা করি। এ ভাবনাও ভুল। আমরা মেয়েদের ইচ্ছে অনিচ্ছের সম্মান দিই। অনাগ্রহী শরীর আমরা সম্ভোগ করি না। আমরা পশু নই, মানুষ, তদুপরি রাজপুত্র। আমরা ব্যবহারের প্রটোকল মেনে চলি।

এবার ইন্দিরা কথা বলেন, অনাগ্রহী শরীর না হোক, প্রেমহীন শরীর তো বটে!

কে বললো সে কথা? আগ্রহের মধ্যেই তো প্রেমের বীজ পোঁতা থাকে। ইচ্ছে সায় দেয়, অনিচ্ছা বাধা দেয়। ইচ্ছে হলেই সমর্পণের ইচ্ছে জাগে। আরেকটা কথা, যে কোন মেয়ের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক হয় না, সম্পর্ক হয় যাকে ভালো লাগে। এই ভালো লাগার মধ্যে তাৎক্ষণিক প্রেমের লক্ষণ আছে।

ইন্দিরা কথার মোড় ঘোরান। বড় বেশি গুরুগম্ভীর কথাবার্তা হচ্ছে। পরিবেশকে লঘু করতে ইন্দিরা বলেন, মা মারা যাবার পর থেকে পদ্মজা নাইডু বাবার পেছনে লেগে আছেন, আমি কি করি বলো তো?

নক্ষত্র হাসতে হাসতে বলেন, বিয়ে দিয়ে দাও।

ইন্দিরা মজা করে বললেন, পাগল! জেলে বউ নিয়ে থাকতে দেয় না।

দুজনেই হেসে উঠেন।

এবার গন্তব্য শ্যামলী। গুরুদেব এখন ওই বাড়িতেই আছেন। সন্ধের পর গুরুদেব নক্ষত্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

নক্ষত্র বললেন, ইন্দু, তুমিও চলো। আমার ভয় করছে। এতোদিন দেখা করি নি বলে হয়তো বকবেন। তুমি গেলে বকুনি থেকে বাঁচতেও পারি। তোমাকে একটু বলে রাখি, আমার বাবাকে উনি পুত্রসম স্নেহ করেন তাই আমার দেখাশোনার ভার নিয়েছেন।

ইন্দিরা বললেন, চল, আমি গেলে যদি বকুনি না খেতে হয় তো আপত্তি করবো কেন? তাছাড়া গুরুদেবের সঙ্গ একটা আলাদা চার্ম।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বুকের ওপর একটা বইকে উপুড় করে রেখে চোখবুজে ছিলেন ইজিচেয়ারে। ওরা যেতেই চোখ খুললেন। বললেন, না ডাকলে আসতে নেই?

নক্ষত্র এই প্রথম পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন গুরুদেবকে। আমতা আমতা করে বললেন, অন্যায় হয়ে গেছে। আসবো আসবো করে আসা হয়ে ওঠে নি।

আসবে, আসবে, তোমাকে দেখলে আমার ত্রিপুরার মহারাজাদের চারপুরুষের সান্নিধ্যের কথা মনে পড়ে যায়। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর ভেবেছিলাম ত্রিপুরার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেলো। আশ্চর্য! বন্ধন এখনো অটুট। এ বড়ো মধুর সম্পর্ক। এ সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক অনেক কথা বলতে হবে।

নীরব হলেন গুরুদেব।

ইন্দিরার ঔৎসুক্য বাঁধ মানে না। বলেন, ত্রিপুরার সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কথা আমাদের বলুন গুরুদেব। আমি কিছুই জানি না।

নক্ষত্রও সায় দিয়ে বলেন, কবি দাদু, তোমার মুখ থেকে ত্রিপুরার কথা শুনতে ইচ্ছে করছে। জানো, বাবাকে লেখা তোমার সব চিঠি আমি পড়েছি।

গুরুদেব নিঃশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করেন, এ এক দীর্ঘ ইতিহাস। ১৮৭৮ সালে 'ভগ্ন হৃদয়' প্রকাশিত হয়। হঠাৎ একদিন জোড়াসাঁকোয় এলেন ত্রিপুরার রাধারমণ ঘোষ। জানালেন, মহারাজ বীরচন্দ্র আমাকে শ্রেষ্ঠ কবিরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমার তখন বয়স অল্প। লেখার পরিমাণ কম, এবং দেশের অধিকাংশ পাঠক তাকে বাল্যলীলা বলে বিদ্রূপ করতো। বীরচন্দ্র তা জানতেন এবং তাতে তিনি দুঃখবোধ করেছিলেন।

সেজন্য তাঁর একটি প্রস্তাব ছিল, লক্ষটাকা দিয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র ছাপাখানা কিনবেন এবং সেই ছাপাখানায় আমার অলংকৃত কবিতার সংস্করণ ছাপা হবে। জীবনে যে যশ পাচ্ছি পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তার প্রথম সূচনা করে গিয়েছিলেন অভিনন্দনের দ্বারা। যিনি উপরের শিখরে থাকেন, তিনি যেমন যা সহজে চোখে পড়ে না তাকেও দেখতে পান, বীরচন্দ্রও আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্র প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর ছিল সহজাত শিল্পীমন। তিনি উর্দু, সংস্কৃত ও বাংলায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁর ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তেমনি ক্যামেরা ও ক্যানভাসে তিনি ছিলেন এক অনবদ্য শিল্পী। তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন ওস্তাদ যদু ভট্ট, কাশেম আলী খাঁ, নিশার হোসেন, কুলন্দর বক্স, কেশব মিত্র, পঞ্চানন মিত্র, ক্ষেত্র বসু, ভোলানাথ বসু, মদন মিত্র এবং আরও অনেকে। সবার নাম মনে পড়ছে না। তাঁর রচিত গীতিকাব্যগ্রন্থ হোরী, ঝুলন, আকাশ-কুসুম, উচ্ছ্বাস, প্রেম-মরিচীকা অসাধারণ কাব্য ও সঙ্গীত-প্রতিভার পরিচায়ক।

এতটা বলে থামলেন রবিঠাকুর। মনে মনে কি যেন গুন গুন করছেন।

গুন গুন করছো কেন? গাও না কবিদাদু?

রবীন্দ্রনাথ বীরচন্দ্রের রচিত সুরারোপিত গান ধরলেন—

কটাক্ষ হিল্লোল হেরি কত কাম মরে ঝুরি
হাসিতে খসায় সুখরাশি।
জিনিয়া মুকুতাভাতি কিবা সে দশন পাঁতি
বিম্বাধরে মনচোরা বাঁশী।

গান থামিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার কথার সূত্র ধরেন— মহারাজ বীরচন্দ্রের অতিথি হয়ে ১৮৯৪ সালে কার্শিয়াং গেলাম। মহারাজা খুবই অসুস্থ। অনেক রাত পর্যন্ত কাব্যালোচনায় মত্ত থাকতেন। প্রতিরাতে মহারাজ আমাকে সিঁড়ি পর্যন্ত এসে বিদায় সম্ভাষণ জানাতেন। এক রাতে আমি অনুযোগ করাতে বীরচন্দ্র কী বললেন জানো? বললেন, 'রবিবাবু, পাছে অলসতা এসে কর্তব্যে ত্রুটি ঘটায় আমি সে ভয় করি, আপনি আমাকে বাধা দেবেন না।' একেই বলে রাজকীয় সৌজন্যবোধ। আমার শোভন সংস্করণ আর হল না। ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি আমার পিতৃসম ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলাম। মনে ভাবলুম, এই রাজবংশের সঙ্গে আমার সম্বন্ধসূত্র এইখানেই অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। কিন্তু তা যে হল না সেটাও আমার পক্ষে বিস্ময়কর। মহারাজ বীরচন্দ্রের অভাবে আমার যে

সৌহৃদ্যের আসন শূন্য হল, মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য অবিলম্বে আমাকে সেখানে আহ্বান করে নিলেন। ১৮৯৯ সালের মাঘ মাসের শ্রী পঞ্চমীর সময়ে ত্রিপুরায় প্রথমবার গেলুম। তার আগের কিছু ঘটনা বলা দরকার। রাধাকিশোর আমার সমবয়সী। বড়ঠাকুর সমরেন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে সিংহাসন নিয়ে রাধাকিশোরের বিরোধ বাঁধে। সে বিরোধ মেটাতে রাজনীতির বেড়াজালে পা ফেলতে হয়। বন্ধু হিসেবে রাজকর্তব্য পালনে সহায়তা যে কি কঠিন কাজ হাড়ে হাড়ে টের পেলুম। মহারাজ চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত। রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে কলিকাতা থেকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করে পাঠালুম। যাকগে ও সব কথা, যা বলছিলুম, বন্ধুত্বের খাতিরে, না ঠিক বললুম না, তাঁর দয়াপরায়ণতায়, গুণশীলতায় রাধাকিশোর বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানকে এক উচ্চতর আসনে স্থাপন করে গেছেন যা অনেকেরই অজানা। আমার স্বপ্নসাধনার একাধিক ক্ষেত্রে তাঁর সামান্য আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও উদার দাক্ষিণ্যের হাত বাড়িয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন-এর পুনঃপ্রকাশের জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার জন্যে কয়েক কিস্তিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য দিয়েছেন রাজকোষের গভীর সঙ্কটের মধ্যেও। জানিস, আমি যখন চাঁদা সংগ্রহের জন্যে রাধাকিশোরের দ্বারস্থ হই, তখন তিনি কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, 'এ বেশ আপনার সাজে না, আপনার বাঁশী বাজানোই কাজ, আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন করিব। প্রজাবৃন্দের প্রদত্ত অর্থই আমার রাজভোগ জোগায়— আমাদের অপেক্ষা জগতে কি আর বড় ভিক্ষুক আছে?' তখন রাজকোষের অবস্থা করুণ, তদুপরি যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরের বিবাহ। উদারপ্রাণ রাধাকিশোর বৃহত্তর আদর্শকে অগ্রাধিকার দিয়ে বললেন, 'বর্তমানে আমার ভাবী বধূমাতার দু'এক পদ অলংকার নাই বা হইল, তৎপরিবর্তে জগদীশ বাবু সাগরপার হইতে যে অলংকারে ভারতমাতাকে ভূষিত করিবেন তাহার তুলনা কোথায়?' বলতো নক্ষত্র, তোর ঠাকুর্দা যদি সেদিন এগিয়ে না আসতেন বাঙ্গলার বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত হতো কি? আরো শুনবি? এই শান্তিনিকেতন তোদের চার পুরুষের মহারাজাদের দাক্ষিণ্য না পেলে জন্মের আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হতো। বাংলা সাহিত্যের প্রতি এতো অনুরাগ বাঙ্গালীদের মধ্যেও চোখে পড়ে না। আবহমানকাল ধরে ত্রিপুরার রাজভাষা বাংলা, এ সত্য এমনকি বিদ্যাসাগরও জানতেন না। মহিমের (কর্ণেল মহিম ঠাকুর) গলার লকেটে ত্রিপুরার মুদ্রা দেখে পড়তে গিয়ে দেখেন বাংলা হরফে লেখা শ্রীশ্রী ধন্যমাণিক্য শ্রীশ্রী কমলা দেবী। আনন্দে চীৎকার করে উঠেছিলেন বিদ্যাসাগর, আমার বাংলাভাষা তবে রাজভাষা?

ইজিচেয়ারে শুয়ে চোখ বুজে স্মৃতিচারণ করছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। চোখে মুখে তাঁর অপার্থিব আনন্দ। মনে হচ্ছে, স্মৃতিচারণে তাঁর হৃদয় আনন্দঘন হয়ে উঠেছে। নক্ষত্রের থেকে ইন্দিরা বেশি উৎসাহী। একটি দেশীয় ছোট রাজ্যের পরিচয় জানতে তাঁর কৌতূহল এবং নানা প্রশ্নের বান রবীন্দ্রনাথকেও উৎসাহিত করে তুলছে। আবার বলতে শুরু করলেন রবিঠাকুর—

দানবীর রাজাদের কতো দানের কথা বলবো রে? দুয়েকটা যা মনে পড়ছে শোন। জ্যোতিদার (জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর) 'সঙ্গীত প্রবেশিকা' নামক মাসিকপত্রটির জন্যে মাসিক পঞ্চাশ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। আমার অনুরোধে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শশী কুমার হেসকে কলিকাতার ত্রিপুরা হাউসে রেখে তাঁর জীবনের চরম দুর্দিনে আশ্রয়দান এবং অর্থ সাহায্য করেন। অন্ধকবি হেমচন্দ্র ও আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন অর্থাভাবে চরম দুর্দশাগ্রস্ত হলে তাঁদের আজীবন বৃত্তি দান করেন। দীনেশ চন্দ্রের 'বৃহৎ বঙ্গ' রাজানুকূল্যে প্রকাশিত হয়। তোরা ভাবছিস, আমি বুঝি মহারাজাদের দামামা পেটাচ্ছি। না রে না, রাধাকিশোর সব দান গোপন রাখতে চাইতেন। আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞাও করিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ আমাকে ধন্য ধন্য করছিল দেখে শেষ পর্যন্ত আমাকে মুখ খুলতে হয়। বীরেন্দ্র কতোবার আগরতলায় যেতে বলেছে। তোর বাবার পীড়াপীড়িতে একবার তবু গিয়েছি। এখন শরীর বৃদ্ধ হয়েছে। চলাফেরায় অসুবিধে হয়। তোরা বোধহয় জানিস না, শান্তিনিকেতনে যে বসন্ত উৎসব হয় এ ত্রিপুরার দান। ত্রিপুরায় হোলি উৎসবে নাচ, গান, বাজনা, আবির, কুমকুম খেলার আনন্দ উৎসবকেই আমি বসন্ত উৎসব নাম দিয়েছি। রবীন্দ্র-নৃত্য বলে যা জানিস তা ত্রিপুরার মণিপুরী রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহের দান। আমি তোদের রাজা রাধাকিশোরের প্রশস্তি করে একটা গান লিখেছিলাম, শুনবি তোরা? ১৯০৭ সালে শীতকালে কলিকাতার অভিজাত সঙ্গীতসমাজ মহারাজকে সম্মানিত করার জন্যে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে আমি বিসর্জন নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করি। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ সেদিন আমার লেখা গানটি পরিবেশন করেন। একটু উন্মনা হয়ে রবীন্দ্রনাথ গাইতে থাকেন -

রাজঅধিরাজ তব ভালে জয়মালা
ত্রিপুর পুরলক্ষ্মী বহে তব বরণ ডালা।
গুণী রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে
মঙ্গল বিরচিত বিচিত্র উপচারে

তরুণ তব মুখচন্দ্র করুণ রস ঢালা
দীনজন দুঃখহরণ নিপুণ তব পাণি,
ক্ষীণজন ভয়তাড়ন অভয় তব বাণী
গুণ অরুণ কিরণে তব সব ভুবন আলা।

গান শেষ করে আবার বলতে শুরু করলেন গুরুদেব — ভারতে বহু রাজা মহারাজাদের দেখেছি, ভারতীয় পুরাণকাব্য পাঠ করে প্রাচীনকালের রাজাদের সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা মনে জন্মায় সেই সব গুণাবলী তোদের ত্রিপুরার মহারাজাদের মধ্যে দেখেছি। সম্পদে হয়তো ত্রিপুরার চেয়ে অনেক ধনী মহারাজারা ভারতে থাকতে পারেন, কিন্তু রাজার যথার্থ গুণের অধিকারী ত্রিপুরার মহারাজাদের মত খুব কমই দেখেছি।

এমন সময় আর্দালী এসে দাঁড়ালো। খাবার তৈরী। গুরুদেব তাঁদের রাত্রির ভোজনে যোগ দিতে বললেন। দুজনেই না না করে গুরুদেবকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এলেন। নক্ষত্র হোস্টেলে থাকেন না। শান্তিনিকেতনের পূর্বদিকে একটা বাড়িতে এক দঙ্গল লোক-লস্কর নিয়ে থাকেন। মেয়েদের হোস্টেলের পথ বিপরীতমুখি। যাবার আগে ইন্দিরা আবেগমথিত স্বরে বললেন, কবিগুরুর সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক আমাকে ত্রিপুরা সম্বন্ধে উৎসাহী করে তুলেছে। ত্রিপুরার কথা আমি ভুলবো না। তোমাকেও না...... ইন্দিরা কথা শেষ না করে লজ্জায় রাঙা হয়ে নক্ষত্রকে আলিঙ্গন করে 'গুড নাইট' বলে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

নক্ষত্র বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। কাল তাকে কলিকাতায় যেতে হবে। কলাবতীর সঙ্গে দেখা করে, কথা বলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। কলাবতীর জন্যে সুন্দর একটা উপহার নিয়ে যেতে হবে। কী সেটা রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে ঠিক করা যাবে।

আজ মাঘ চতুর্দশী। কলাবতীর জন্মদিন। খুব সকালে উঠে কলাবতী স্নান সেরেছেন। কপালে চন্দনের টিপ পরেছেন। বাইরে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ। ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে লাগছে। ঘুম থেকে কেউ এখনো উঠেন নি। বৃষ্টির রিম্ ঝিম্ শব্দ কলাবতীর উদাসী মনকে উতলা করে তুলেছে। কলাবতী কাগজ কলম নিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন। কলমের বাঁটটা কপালে ঠুকতে ঠুকতে কি যেন ভাবলেন, তারপর লিখতে শুরু করলেন—

আজ জন্মোৎসব সেই রাজকন্যার।
ওরা জানে না, ধান্ দূর্বা আশীর্বাদ
সব ব্যর্থ হবে, জমাট চোখের জল
শুধু শূন্যতা বিছাবে।

দুর্বার গতি যার স্নেহ মায়া বন্ধনহীন
যে শোনে না পথের বাধার কোন অনুনয়
দেখেনি পিছু ফিরে ফেলে গেলো কারে
ধান দূর্বা আশীর্বাদ তবু তার তরে?

শ্রাবণ রজনী কাঁদে মনের গহনে যার।
যে শোনে কান্না, শুধু কান্না অনিবার
জন্মোৎসব পালিত হয় তার
যে ভুলে গেছে হাসি, গান, যার মুষ্টিতে কৃপাণ
ছিন্ন করে দেয় সমাজশৃঙ্খলা, ফেলে দেয়,
মন্ত্রপড়া বিবাহের মালা?
নারীর নম্রতা নাই, দৃষ্টি ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে

আশীর্বাদ শুভেচ্ছা বৃথা জানানো তাকে।
সার্থক হল কি জন্ম তোমাদের রাজকন্যার?
উত্তর দিলো না কেউ মূক, মুখ চেয়ে থাকে
ভাষাহীন চোখে।

যে নিষ্ঠুর পরিহাসে জীবনকে ভালোবাসে
তার জন্যে এতো আয়োজন?

আরো কিছু লিখতে যাচ্ছিলেন, দরজায় টোকা। বাইরে থেকে মা-র গলার আওয়াজ। দরজা খুলে দিলেন কলাবতী। কলাবতী স্নান সেরে নতুন শাড়ী পরেছেন দেখে জীবনকুমারী দেবী খুব খুশি হলেন। মেয়েকে বললেন, চল, সবাই মন্দিরে অপেক্ষা করছেন। গ্রহপূজার পর তোকে আশীর্বাদ করা হবে।

মন্দিরে এসে কলাবতী দেখলেন সবাই এসে গেছেন। বহিরাগতদের মধ্যে বীরেন্দ্র, মল্লিকাদি, শিবদাজী, বীণাকুমারী, মাসতুতো দিদিরা মন্দিরের সামনে গালিচার উপর বসে আছেন। ত্রিপুরার নিয়মমতো মন্দিরের সামনে উঁচু আসনে বসা বারণ। সবাই তাকে দেখে একযোগে গেয়ে উঠলো — হ্যাপি বার্থডে টু য়ু। মা, মাসি-পিসিরাও যোগ দিলেন।

কলাবতী ভিড়ের মধ্যে একজনকে খুঁজছিলেন। হতাশ হয়ে মনে মনে ঠিক করলেন, দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন, কথা বলবেন না। বিফলমনোরথ কলাবতী মন্দিরে ঢুকে তার নির্দিষ্ট আসনে বসলেন।

গ্রহপূজা শেষ হল। আশীর্বাদপর্বও সাঙ্গ হল। তাঁর দেখা নেই। মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখে শিবদাজী এগিয়ে এলেন। শিবদাজী নেপালের পদ্মজং জেনারেলের ছোটভাই। সম্পর্কে আত্মীয়। প্রাণখোলা লোক। একটু বেশি নেশাভাঙ্গ করেন। বীরেন্দ্র একটু দূরে দাঁড়িয়ে কলাবতীকে লক্ষ্য করছেন। সেদিনের ঘটনার পর হয়তো মন মেজাজ খারাপ। কলাবতী ঠিক করলেন, শিবদাজীর হাত থেকে মুক্তি পেতেই বীরেন্দ্রর মান ভাঙ্গাবেন। মুক্তি পাবার সবচাইতে সহজ উপায় উপদেশ দেওয়া। কোন মানুষই উপদেশ সহ্য করতে পারে না। মূর্খরা রাগ করে আর বিজ্ঞদের অহংবোধে লাগে। সহজ পথটাই বেছে নিলেন কলাবতী।

শিব বললেন, চল, চল, লনে গিয়ে একটু পায়চারি করি। বৃষ্টি থেমে গেছে। বসে

বসে থকে গেছি।

যেতে যেতে কলাবতী বললেন, তোমাকে আজ একটু উপদেশ দেবো।

কি উপদেশ দেবে, দাও না। আমি তো শুনতে সবসময়েই রাজি। সবাই যা বলে তাই তো? গাঁজা, ভাঙ্গ, মদ খেয়ো না। দাও, যতো ইচ্ছে গাল দাও।

যে আত্মসমর্পণ করে তাকে গাল দেওয়া যায়না।

কলাবতী বললেন, কেন গাল দেবো বলো তো?

দুঃখের হাসি হেসে শিব বললেন, সবাই বলে উচ্ছন্নে গেছি, আমার চালচলন নাকি ভালো নয়।

শিবজীর মুখ দেখে কষ্ট হল। কলাবতী কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেন, তুমি নাকি ছবি আঁকো, সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি।

কি আঁকো তুমি?

আমি এখন শরীরবিজ্ঞান চর্চা করছি। আমার বেশ কিছু সুন্দরী মডেল আছে। আমি তাদের বিভিন্ন ভঙ্গীমার ছবি আঁকি।

তাই নাকি?

হাঁটতে হাঁটতে কলাবতী লক্ষ্য করলেন, দোতলার ব্যালকনি থেকে বীরেন্দ্র তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

শিব ছেলেমানুষের মতো বলতে লাগলেন, দ্যাখো, তুমি ছবি আঁকো, আমিও ছবি আঁকি, তুমি গাও, নাচ— আমি চেষ্টা করি। যা যা তোমার ভালো লাগে, আমারও তা ভালো লাগে। এখানে সবাই মনে করে আমি তোমার ভক্ত। দাজী প্রায়ই তোমার গুণের কথা বলেন। আমাকে উপদেশ দেন, এটা কোরো না, ওটা কোরো না।

কলাবতী বলেন, বাজে জিনিস খাও কেন? ছেড়ে দাও।

শিবজী হাসতে হাসতে বলেন, জিনিস কেউ খায় নাকি? তবে তো চেয়ার টেবিল সব খেতে হয়।

কথা শুনে না হেসে পারেন না কলাবতী। শিব অত্যন্ত সরল, ছেলেমানুষ। যেমন ভালো মন, তেমনি সুন্দর চেহারা। ছোটছেলের মতো তাঁর ব্যবহার। সবাই তাঁর জন্যে দুঃখবোধ করেন। কলাবতীও। তাঁকে আর শোধরানো সম্ভব নয়। ওর বৌ ছেলেমেয়ের কথা ভেবে মনে মনে কষ্ট পান কলাবতী। মাতা বড়মহারানী তাঁর স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য নৈনিতাল যাবেন।

কলাবতী সস্নেহে শিবের হাত ধরে বললেন, চল এবার যাই। সবাই অপেক্ষা করছেন।

ব্যালকনিতে বীরেন্দ্রকে দেখা যাচ্ছে না। হলঘরে আছেন ভেবে কলাবতী হলঘরে এলেন। না, এখানেও নেই। এতো বড় মহলে কোথায় খুঁজবেন তাঁকে? আজ তার জন্মদিন বলে সবাই শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, কথাও বলতে চাইছেন। না, তার পক্ষে খোঁজাখুঁজি সম্ভব নয়। অনেক কাজ পড়ে আছে। সন্ধেবেলা পার্টি হবে। দাদা শচীন (শচীন কর্তা), ব্রজেন বিশ্বাস, কৃষ্ণচন্দ্র দে, দিলীপ কুমার রায় আর কারা সব আসছেন। গান-বাজনা হবে। সব ঠিকঠাক বন্দোবস্ত করতে হবে। মা-মাসিরা বোধহয় তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন। তারই বলার কথা, কোথায় কি হবে। বার-এ কি কি মজুত আছে তাও সে দেখে নি। না আর দেরি করা চলবে না। কলাবতী সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় বার-এর দিকে এগিয়ে যান। পার্লারের পাশেই খোলা বার। বীরেন্দ্র, শিবদাজী, মল্লিকাদি আরো কয়েকজন বার-এ বসে বিয়ার খাচ্ছেন।

বীরেন্দ্র-র দিকে তাকিয়ে বললেন কলাবতী, ওমা একি! এখনই সুরু করে দিয়েছেন? সন্ধে অবধি তর সইলো না?

বীরেন্দ্র লাজুক মুখে বললেন, একটু বিয়ার খাচ্ছি। মদ খাবো রাত্রিবেলা।

বিয়ার বুঝি মদ নয়?

মল্লিকাদি ফু ফু করে সিগারেট টানছেন আর বীরেন্দ্র-র গায়ে ঢলে পড়ছেন।

শিবদাজী এক চুমুকে বিয়ারমগ শেষ করে বললেন, কলাবতী চিয়ার্স।

কলাবতী হেসে বললেন, এখন নয়, পরে। আমার অনেক কাজ আছে।

বারম্যান তিলকচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন, স্টকে কী কী আছে বলবে?

তিলক বললো, আজ্ঞে সবই আছে। শ্যাম্পেন, হুইস্কির মধ্যে রয়্যাল স্যালুট, ব্ল্যাক লেবেল, সিভাস রিগ্যাল, হোয়াইট এবং রেড ওয়াইন, জিন, ভডকা, লিক্যুয়র।

কি লিক্যুয়র? কনথ্রো আছে? ড্রামবুই আছে?

তিলক ঘাড় নেড়ে বলে, আছে।

পঞ্চাশ জনের হবে তো?

আজ্ঞে।

কলাবতী বীরেন্দ্র-র দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাকে খুঁজছিলাম। যাক, এখন রসভঙ্গ করবো না, পরে কথা হবে।

বীরেন্দ্র উঠে পড়েন।

পরে কেন? চলুন পার্লারে ওই কোণে বসা যাক।

কলাবতী বিনীতভাবে বললেন, আমার যে এখন অনেক কাজ রাজাসাহেব! কাজ শেষ হয়ে গেলে আপনাকে খুঁজে নেবো।

যো আজ্ঞা, বলে বীরেন্দ্র আবার হতাশভাবে বসে পড়েন।

সন্ধে হয় হয়। গাছের মাথায় পাখিদের কলকাকলি শোনা যাচ্ছে। সবাই কুলায় ফিরে এসেছে। ল্যাম্পপোস্টের লাইট জ্বলতে শুরু করেছে। যাঁর আশায় কলাবতী প্রহর গুণছেন তাঁর দেখা নেই। মাঝে মাঝে কলাবতীর সন্দেহ হয়, সত্যিই নক্ষত্র তাকে ভালোবাসে কিনা? তাকে দেখলেই নক্ষত্রের চোখে কামের আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু প্রেমের সেই স্নিগ্ধতা, মুগ্ধতা, নিবিড়তা ধরা পড়ে না কেন? তবে কি সবটাই দেহজ? প্রেমের যেসব গুণ, পারস্পরিক বিশ্বাস, ত্যাগ, সহানুভূতি, কাছাকাছি থাকার আনন্দ, তার বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই নক্ষত্রের চরিত্রে। সে দস্যুর মতো লুটেপুটে খেতে চায়। তার অর্থ, এ শরীরটার উপর যখন বিতৃষ্ণা জাগবে তখন কলাবতী আর নক্ষত্রের থাকবে না। কলাবতী তার স্বপ্নের প্রেমিকের (নাম নক্ষত্রও হতে পারে) কথা ভাবেন। চারদেয়ালের কূপমণ্ডুকতা থেকে তিনি তার প্রেমিকের মধ্যে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। যে প্রেমিক তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবে। মনে পড়ে—কুহরণের (কলাবতীর কবিতার বই) শেষ পাতায় তার স্বপ্নের প্রেমিকের উদ্দেশে কলাবতী লিখেছেন—

'হে আমার অশান্ত হৃদয়ের প্রিয়, সঙ্গবিহীন সঙ্গীতে তুমি ছন্দ খুঁজো না। একূল-ওকূল যার নেই, সাগরে মিশে গিয়েও তরঙ্গে যে আছড়ে পড়ে, যার বিশ্রাম নেই, তার কুহরণে তোমার বজ্রহৃদয় ক্রন্দনে ডুবিয়ে দাও, ডুবিয়ে দাও।

সূর্য যখন ডুবে যাবে, পাখীরা নীরব হবে তখন তুমি নিথর ঘুমের আলিঙ্গনে আমায় নাও, নিবিড় হয়ে এসো বন্ধু, এসো - আমার দুকূল প্লাবিয়া এসো।

আমি অসমাপ্ত, অতৃপ্ত, তোমার পূর্ণতায় আমাকে নাও, সমাপ্ত কর, সম্পূর্ণ কর। মহামিলনে লয় কর।

আমার গানের তুমি আদি, তুমি মধ্য, তুমিই শেষবিন্দু।'

কলাবতী ভাবেন, তার স্বপ্নের পুরুষের সঙ্গে নক্ষত্রের এতো অমিল কেন? তবে কি স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে, বাস্তব—বাস্তব। মেনে নিতে মনে যে দুস্তর ব্যবধান, তার সেতুবন্ধনের উপায় জানা নেই বলে মানুষের এতো দুঃখ।

চিন্তা বাধা পায়। গেট দিয়ে একটা গাড়ী ঢুকলো। কলাবতী উঁকি মেরে কিছু

দেখতে পান না। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাথার ক্লিপটা খুলে পড়ে যাওয়ায় তুলতে যাচ্ছেন এমন সময় কে যেন পেছন থেকে জাপটে ধরলো তাকে। কলাবতী চিৎকার করতে যাচ্ছিলেন, পারলেন না, আগুনের মতো নিঃশ্বাস আর গরম ঠোঁট তার মুখ বন্ধ করে দিলো। কোনমতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কলাবতী ভর্ৎসনা করে বললেন, ছিঃ ছিঃ এ কি হচ্ছে? লজ্জাশরমের মাথা খেয়েছো নাকি? কেউ দেখতে পেলে মান-সম্মান থাকবে?

না থাকুক। নক্ষত্র নির্বিকার।

তোমার কি? তুমি তো ধেই ধেই করে শান্তিনিকেতন চলে যাবে। কথা তো শুনতে হবে আমাকে।

একটু না হয় শুনলে, ক্ষতি কি?

মা যদি তোমাকে দেখতে পায়, এক্ষুনি তাড়াবে।

তাড়ালে যাবেটা কে?

কেন তুমি?

দূর পাগলী, যেতে আমি থোড়াই এসেছি। যখন যাবো নিজের ইচ্ছেয় যাবো।

বাব্বা! খুব বীরপুরুষ! ডাকবো নাকি মাকে?

ডাকো, ডাকো, পৃথিবীসুদ্ধু লোককে ডাকো, আমি ভয় পাই না। চিৎকার করে বলবো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

এতোই যদি ভালোবাসা, এতো দেরি করে এলে কেন?

ট্রেন থেকে নামলাম চারটেয়। নিউমার্কেটে গেলাম। বৌবাজার গেলাম।

নিউমার্কেটে, বৌবাজারে কেন?

বলছি, পেছন ফিরে দাঁড়াও।

না বাবা, তোমার আবার কী মতলব কে জানে?

দাঁড়াও বলছি।

আচ্ছা বাবা, দাঁড়াচ্ছি।

নক্ষত্র হীরের নেকলেস কলাবতীকে পরিয়ে দিলেন। বাধা দেবার আগেই কলাবতীকে জড়িয়ে ধরে......... কলাবতী অস্ফুটে বলতে পারলেন, দস্যু কোথাকার।

শচীন কর্তার সঙ্গে এসেছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, ব্রজেন বিশ্বাস, দিলীপ কুমার রায়, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অহীন্দ্র চৌধুরী। আজই শচীন কর্তার হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস থেকে প্রথম রেকর্ড

বেরিয়েছে। শচীন কর্তা একটা রেকর্ড বগলদাবা করে নিয়ে এসেছেন সবাইকে শোনাতে। গানবাজনা শুরু হবার আগে রেকর্ডটা বাজানো হবে। সবাই শচীন কর্তাকে অভিনন্দন জানালেও মা-মাসিদের মুখ দেখে মনে হল না খুশি হয়েছেন। শচীন কর্তা এই ত্রিপুরা হাউসেই থাকতেন। গানবাজনার জন্যে রাজভাতা ত্যাগ করে তিনি একটা ছোট্টবাড়ি ভাড়া করে থাকেন। বাড়ি বলতে একখানা ঘর। রাজবাড়ির ছেলে এমনভাবে থাকলে রাজপরিবারের মান-সম্মান থাকে না। তাছাড়া রাজার ছেলে পথে-ঘাটে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে এটা রাজপরিবারের পক্ষে সম্মানজনক নয়। শচীন কর্তাকে উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়, মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য সেতার ও বাঁশীতে মালকোষ রাগে রেকর্ড করেছিলেন কিন্তু গ্রামাফোন কোম্পানীর শত অনুরোধেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাজারে ছাড়তে অনুমতি দেন নি। শচীন কর্তার চালচলন রাজ-পরিবারের সম্মানহানিকর বলে রাজপরিবার পারতপক্ষে তাঁকে আমল দিতেন না। বরং বলা যায়, এড়িয়ে চলতেন। এককালে জীবনকুমারী দেবীর তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু শচীন তাঁর ছাত্রী মীরাকে বিয়ে করতে চলেছেন শুনে জীবনকুমারী দেবীর স্নেহ ফুৎকারে উবে গেলো। একে রাজকুমার হয়ে বাঈজীর মতো যেখানে সেখানে পয়সার জন্যে গান গাইছেন, দ্বিতীয়ত- ক্ষত্রিয় হয়ে কায়স্থ বিয়ে করবেন, অতোটা বাড়াবাড়ি সহ্য করা রাজপরিবারের ক্ষমাতীত।

মেয়ে তার জন্মদিনে দাদা এবং তাঁর বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছে বলে জীবনকুমারী দেবীর সৌজন্যবোধ কোনরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরী করা থেকে সবাইকে নিরস্ত করলো। শচীন কর্তাকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, কর্তা আপনার রেকর্ড বাজান, আমরা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি।

এমন সময় নক্ষত্র হঠাৎ সেই রেকর্ড বগলে চেপে মজা করে চারদিকে ঘুরতে লাগলেন।

শচীনকর্তা চেঁচিয়েই চলেছেন, আরে এইডা একটা মাত্র কপি, ভাইঙ্গা গেলে আর পাইতাম না।

নক্ষত্রের কাণ্ড দেখে জীবনকুমারী দেবী বিরক্ত হলেন। আদেশের সুরে বললেন, রেকর্ড বাজাও।

শচীন কর্তার প্রথম গান রেকর্ডে বাজলো—

ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে
মাঠের বাটে যাই
আকাশ তথা উষার শিখায়
সিঁদুর মাখায় ভাই......

গান শেষ হতে সবাই সাধু সাধু বলে প্রশংসা করলেন। শচীন কর্তা এবার হাতজোড় করে বললেন, আমার ত্রুটি মার্জনা করুন। প্রথম গান গাইবার অধিকার আমার গুরু কেষ্ট বাবুর। আনন্দের আধিক্যে আমি অন্যায় করে ফেলেছি।

বার-এর টুলে বসা শিবদাজী ও তাঁর দলবল সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, অন্যায় মাপ। লেট আস সেলিব্রেট কলাবতীস্ বার্থডে। শ্যাম্পেন খোলা হোক।

কলাবতী শ্যাম্পেন ঝাঁকিয়ে কর্ক খুলতেই কর্কটা স্যান্ডেলিয়ারে গিয়ে আটকে গেলো। সবাইকে শ্যাম্পেন দেবার পর টোষ্ট হল।

চিয়ার্স। লঙ লিভ কলাবতী।

হারমোনিয়াম ধরলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। তবলায় সঙ্গত করবেন তরুণ ব্রজেন বিশ্বাস। বেয়ারারা ট্রেতে পছন্দমত ড্রিঙ্কস্ বিতরণ করছে। ত্রিপুরার রাজপরিবারে গানবাজনার সময় কথা বলা বারণ। এতে শিল্পীর মনোযোগ নষ্ট হয়। শিল্পীকে অসম্মান করা হয়। হলের মধ্যে তাই নৈঃশব্দ্য বিরাজমান। কেউ মদ খেয়ে অসংলগ্ন কথা বললে, অভদ্র আচরণ করলে বা বমি করলে তাকে আসর থেকে বিতাড়িত করা হয়। এটাই নিয়ম।

কৃষ্ণচন্দ্র দে ফিটফাট লোক। একের পর এক শ্রোতাদের অনুরোধে গাইলেন —

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু/ভালোবেসে কেঁদে মরি/সখি লোকে বলে কালো/নয়ন থাকিতে নয়নে এল না।

দিলীপ কুমার রায় কীর্তন গাইলেন এবং সবশেষে— ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে.....

এবার সবার অনুরোধ, কলাবতীকে তার জন্মদিনে গাইতে হবে। কলাবতীর না-না কেউ মানলেন না। হারমোনিয়াম বাজাবেন জীবনকুমারী দেবী। ব্রজেন বিশ্বাস তবলা নিয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ জাম্বুবানের মতো লাফ মেরে নক্ষত্রের আবির্ভাব। ব্রজেন বিশ্বাসকে বললেন, ওর সঙ্গে বাজানো আপনার কম্ম নয়। সা থেকে নয় ও মা থেকে সুরু করে। মাত্রা রেখে ওর তালে তালে একমাত্র আমিই বাজাতে পারি। অনেক দিনের অভ্যেস।

হেসে সরে বসলেন ব্রজেন বিশ্বাস।

কলাবতী আসরে এসে বসলেন। নক্ষত্রকে বললেন, তাল কেটে গেলে রাগ করবে না কিন্তু, মাত্রা ঠিক করে দিতে হবে।

নক্ষত্র হেসে বললেন, তুমি মন দিয়ে গাইলে মাত্রা, লয় আপনি আপনি ঠিক হয়ে যাবে। গাও, আমি বাজাচ্ছি।

কলাবতী গেয়েছিলেন তার সুরারোপিত নিজস্ব রচনা। সুর - বাগেশ্রী।

সুদূরে ভালোবাসা লয়ে দিগন্তে আছ ছেয়ে

বসন্ত বিরহী দীরঘ নিঃশ্বাসে
বলে আজ কেহ নাই নাই কাছে
ওরে ও অবুঝ বুঝেও বোঝ না
ঝরা পাতায় নূপুর বাজায়ে যে গেছে
সে তো ছলনা।

গান শেষ হলে শচীন কর্তা বললেন, তোমার গলার তো খুব উন্নতি হয়েছে। আগের থেকে অনেক ভালো।

শচীন কর্তা যখন আগরতলায় যেতেন কলাবতী তাঁর কাছে গান শিখতেন। শচীন কর্তার গান নিজের মতো করে গাইতেন বলে তিনি তার নাম দিয়েছিলেন 'অরিজিন্যাল'।

এবার শচীন কর্তা গাইবেন। মেয়েরা সবার অলক্ষ্যে মুখে আঁচলচাপা দিলেন। কারণ একটাই — গাইবার সময় তাঁর মুখের নানাপ্রকার আকৃতিবিকৃতি হয় যা হাসির উদ্রেক করে। চোখ বুজে গান শোনাই ভালো। নজরুল, শচীন কর্তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনেরই কুমিল্লায় বাড়ি। তাই বোধ হয় নজরুল দিয়ে গান শুরু করলেন শচীন কর্তা। একে একে গাইলেন — পদ্মার ঢেউরে, কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া, চোখ গেল চোখ গেল, এই পথে আজ এসো প্রিয়া। সবশেষে গাইলেন— ডাকলে কোকিল............ আসর মাত করে দিলেন শচীন কর্তা।

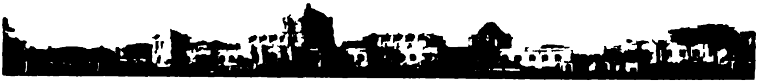
পাহাড়ী সান্যাল উশখুশ করছিলেন। তাঁকে গাইতে বলা হচ্ছে না দেখে শচীন কর্তাকে কনুই দিয়ে এক জব্বর খোঁচা মারলেন।

শচীন কর্তা 'কি হল' বলতে গিয়ে না বলে পাহাড়ী সান্যালের কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি?

পাহাড়ী আহতস্বরে বললেন, আমাকে কি মুখ দেখাতে নিয়ে এসেছো?

শচীন কর্তা হা হা করে হেসে ঘোষণা করলেন—এবার সঙ্গীত পরিবেশন করবেন বায়স্কোপের প্রখ্যাত তরুণ নায়ক শ্রী পাহাড়ী সান্যাল।

সকলে হাততালি দিলো। অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস মুচকি হাসলেন। পাহাড়ী সান্যাল প্রথমে গাইলেন—পানীয়া ভ রনে কৈসে যাও সজনী। তারপর গাইলেন গজল—সাঁইয়ারে না যাইও, যমুনা কিনারে মেরা ঘর..........



প্রায় পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হল। একঘেয়েমির জীবনেও সময় থেমে থাকে না। নক্ষত্র ছুটিতে এলে দু-তিনবার দেখা হয়েছে। মন ভরে নি। সম্পর্কে কী যেন নেই হাহাকার কলাবতীকে আনমনা করে, দুঃখ দেয়। নক্ষত্র বেপরোয়া হন। কলাবতীর ভাবসাব তাঁর পছন্দ নয়। সোজাসুজি প্রশ্ন করেন। উত্তর দিতে কলাবতী রবীন্দ্রনাথ আওড়ান - 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।'

নক্ষত্র রাগ করে বলেন, তোমার বড় বেশি অহংকার কলি! অহংকারের জন্যেই তুমি একদিন আমাকে হারাবে। এতো অহংকার ভালো নয়।

কথা রেখেছেন নক্ষত্র। আজ তার বিয়ে। কুচবিহারের রাজকন্যা ইলা দেবীকেই বিয়ে করছেন। রাজবাড়িতে, লালু কর্তার মহলে সানাই বাজছে। রাজবাড়ি থেকে দু'শ জন বরযাত্রী গেছেন। কলাবতীকেও যেতে বলা হয়েছিল। কলাবতী যান নি। যাঁরা কলাবতীকে সহানুভূতি জানাতে পারতেন তাঁরাও গেছেন কুচবিহার। কলাবতী এখন একা থাকতে চাইছেন। কারো উপস্থিতিই তার ভালো লাগার কথা নয়। কান্না বুকের মধ্যে গুমরে উঠছে কিন্তু বেরোবার পথ পাচ্ছে না। কলাবতী বড় বেশি একা হয়ে গেছেন।

'একা' কথাটাতেই ধাক্কা খেলেন কলাবতী। ভুল, ভুল, তার এক আলাদা জগৎ আছে, যেখানে কারো প্রবেশাধিকার নেই। সে তার সৃষ্টির জগৎ। সেখানে কলাবতীই সর্বেসর্বা, স্বয়ম্ভু, স্বাধীন।

জীবন একটা বৃত্তের মধ্যে ঘোরে না। হয় সামনের দিকে নয় পেছন দিকে চলে। নতুবা ভেসে ভেসে চলে। ভেসে চলার মধ্যে কোন আনন্দ নেই। গতানুগতিক চলা। গতানুগতিকতায় মানুষ বাঁচে না। মানুষের আনন্দ চাই। এই আনন্দ স্বতোৎসারিত — প্রাণে জন্ম, প্রাণেই লুপ্তি। অহেতুক আনন্দ চাওয়া-পাওয়ার উর্দ্ধে। সে তো ভূমানন্দ। সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আর এক আনন্দ আছে, সৃষ্টির আনন্দ। ঋষি বাল্মিকীর মুখ থেকে ক্রৌঞ্চের বেদনায় শ্লোক উচ্চারিত হলে সৃষ্টির আনন্দে তিনি আত্মহারা হয়েছিলেন। কলাবতী সেই আনন্দেরই খোঁজ পেয়েছেন। যে-দুঃখ তার

বুকের গভীরে বর্ষার মেঘের মতো গুমরে গুমর উঠেছিল, বৃষ্টিপাতের পর তার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। সময়ের ভারবোধ লোপ পেয়েছে। সৃষ্টির আনন্দে মাতবেন কলাবতী। সাহিত্যে, শিল্পে নতুন কিছু করার প্রয়াসে তিনি কবিতা লিখবেন, গান লিখবেন, সুর দেবেন, ছবি আঁকবেন।

সৃষ্টি তার নিজস্ব জগৎ। সে জগৎ নিয়ে মেতে আছেন কলাবতী। নৃত্য পরিকল্পনা করে অনেক কবিতা, গান, কাহিনী লিখেছেন—নাম দিয়েছেন 'শিঞ্জন'। তার ভূমিকায় লিখেছেন—

'ভারতীয় নৃত্যে সাবেকী বেশভূষা ও পৌরাণিক বিষয় দেখা যায়, তা গতানুগতিক ধারায় আছে। নৃত্যে এমন অনেক মুদ্রা দেখানো হয় যা সকলের বোধগম্য নয়। যথা, ত্রিপতাকা, অঙ্কুশ, চাঁদ, সূর্য। প্রজাপতি, হরিণ, পদ্ম, শঙ্খ কিছুটা বোঝা যায়। শিব দুর্গা মুদ্রা বুঝতে হলে দস্তুরমতো আগে থেকে ইঙ্গিতার্থ জানা দরকার, সর্বসাধারণের পক্ষে তা সম্ভব নয়, এ কারণে বিনোদনের জন্যে বিষয়বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বেশভূষা ও দৃশ্যাদি রেখে নৃত্য পরিবেশন করছি।

যাঁরা প্রকৃতি-উপাসক, নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন নদ-নদীর বিবিধ গতি, সমুদ্রের আলোড়ন, উড়ন্ত পাখির পাখা সঞ্চালন, ঝড়ের মাতন, ঝর্ণার গতিবেগ, প্রজাপতির চঞ্চলতা। এসব ছন্দে ও ভঙ্গিমায় নৃত্য বিষয়ভুক্ত করে এবং বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বেশভূষা ও দৃশ্যাদি দ্বারা বোধগম্য করার জন্য শিঞ্জনে বিশেষভাবে রেখেছি বাদ্যযন্ত্র, বেশভূষা যা নৃত্যের বিশেষ অঙ্গ। নৃত্যমঞ্চে বর্ণনা অনুযায়ী দৃশ্যাদি রাখা হলে নৃত্যবিষয়টি সুস্পষ্টভাবে আনন্দ দিতে পারে। আমি আশা করি, কোন শিল্পীর নূপুর চরণে আমার পরিকল্পনাগুলি শিঞ্জিত হবে। কবিতার ছন্দে ও আবৃত্তিতে, তদানুযায়ী দৃশ্য ও আলো এবং সঙ্গীতে শিঞ্জন তোলার চেষ্টা করেছি। নৃত্যতালিকা— সূর্যতপা, সমুদ্র উল্লাস, মরুউদ্যান, সমুদ্র অভিসারিকা, ঝরা পাতা, ফুল ও প্রজাপতি, বাঁধনহারা বসন্ত, বাঁশী বাজে বনমাঝে না মনমাঝে, পৃথিবীর জন্ম ইতিহাস, লীলাময়, কৃষ্ণরূপা, মহারাস, তুফান, বিদ্যুৎ, সাপুড়ে ও সুপ্ত কামনা, সাবরী গীতিনৃত্য, বাউল নৃত্য, কুমারসম্ভব, উর্বশী।

আমার কবিতা, গান, গীতিনাট্য ও গদ্যরচনা পড়ে ভবিষ্যতে কেউ নাচবে, গাইবে আমার নৃত্যসঙ্গীত - এ আশা করা যায় না কি?'

কলাবতীর গীতিনাট্যের সঙ্গে নির্দেশিকা আছে। পরিচালনার সুবিধার্থে।

প্রায় তিন মাস হয়ে গেল নক্ষত্রকিশোর ইলাদেবীকে বিয়ে করে আগরতলায়

ফিরে এসেছেন। এখনো কলাবতীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। নক্ষত্র হয়তো এখন নতুন রানীর প্রেমে মশগুল। কলাবতীর মন পাথর হয়ে গেছে। সুখ, দুঃখ, কৌতূহল কোন ভাবেরই উদ্রেক হয় না। লোকমুখে শুনেছেন নতুন বৌয়ের রং খুব ফরসা নয়, শ্যামলা। দেখতে সুন্দরী। আধুনিকা। ত্রিপুরার রাজপরিবারের বাধানিষেধ নিয়মকানুন তাঁর পছন্দ নয়। চিকের আড়াল থেকে কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত নন। চার দেয়ালে বন্দি থাকতে বিয়ে করেন নি। খোলামেলা জীবন কাম্য তাঁর। গাড়ী নিয়ে যখন খুশি বেরিয়ে পড়েন বলে নক্ষত্র মহাবিপাকে পড়েছেন। স্নান সেরে চুল শুকোতে হুড্‌খোলা জীপগাড়ি নিয়ে নাকি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। বাবা লালু কর্তার এইসব মোটেই পছন্দ নয় জানিয়ে নক্ষত্রকে সাবধান করে দিয়েছেন। কলাবতী শুনেছেন, নক্ষত্রের সঙ্গে ইলা দেবীর এ নিয়ে মহাবিবাদ চলছে।

কলাবতী ভাবেন, হয়তো এ সব কারণেই নক্ষত্র রাজ-অন্দরে আসছেন না। এখানে যদি হঠাৎ-ই মহারাজ বীরবিক্রমের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তো নক্ষত্রের ছল-ছুতো চলবে না। বীরবিক্রম রাজপরিবারের আদব-কায়দা মানতে নক্ষত্রকে বাধ্য করবেন নতুবা বহিষ্কারের হুমকি দেবেন। কলাবতীর নক্ষত্রের জন্যে দুঃখ হয়। বিয়ে করে কি বিপাকেই না পড়েছেন বেচারা।

নক্ষত্রের কথা ভাবতে গিয়ে কলাবতীর বুকটা হু হু করে উঠলো। তার মনের অবস্থা কেউ জানে না। নক্ষত্রকে ভুলতেই তো সারাদিনরাত কবিতা, গান, ডায়েরী লিখে চলেছেন। শক্ত মাটিতে পা পড়েছে বলে মধুমালঞ্চের দিনগুলো তো হারিয়ে যেতে পারে না। নক্ষত্রকে ঘুরে ফিরে যে তার কাছেই আসতে হবে।

এই তো সেদিনের কথা। নক্ষত্র এসে কোনরকম ভূমিকা না করেই বললেন, কলি, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

বলার আকস্মিকতায় বিমূঢ় কলাবতী বললেন, সব জেনেশুনে এ কি বলছো তুমি?

আমার কথার উত্তর দাও।

ও কথার উত্তর আমার জানা নেই।

মানে?

সব কথার মানে হয় না নক্ষত্র! তোমার প্রতি কোন নিষ্ঠুর আচরণ হোক আমি চাই না।

আর তোমার প্রতি?

রাজশক্তিতে আমি বিশ্বাসী নই। রাজরোষকে আমি ভয় পাই না।

তবে কিসের আপত্তি?

আপত্তি কোথায় তুমি ভালো করেই জান?

না আমি জানি না, তুমি বলো।

আমার এ খাঁচা তোমার জন্যে নয়। আমার ভয় করে। বেশি কাছাকাছি এলে আমার স্বপ্নের নক্ষত্র হারিয়ে যেতে পারে।

হেঁয়ালি ছেড়ে সোজাসুজি কথা বল কলি? তুমি কি আমাকে ভালোবাস না?

বাসি। অনেক ভালোবাসি, কিন্তু আমার মনে হয় তুমি মোহগ্রস্ত। যে কোন মুহূর্তে তোমার মোহ কেটে যেতে পারে। আমার সৃষ্টির জগৎ নিয়ে আমি এক কূলে দাঁড়িয়ে আছি, অকূলে ভাসতে চাই না। লোকের সমবেদনা আমার সহ্য হয় না।

সেই কবে থেকে তোমাকে ভালোবাসি, তবু বিশ্বাস হয় না।

হয় না বলেই তো না করছি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই দাঁড়ায়। মনে সন্দেহের কাঁটা থাকা ঠিক নয়।

কিসের সন্দেহ?

সন্দেহ নিরসন করার ক্ষমতা তোমার থাকতো যদি এক্ষুনি হাঁ বলে দিতাম।

সে কি আমার প্রতি সন্দেহ?

কথাটা মিথ্যে নয়। কাছাকাছি থাকার ফলে বিবাহিত জীবনে দোষগুলি প্রকট হয়, দূর থেকে যা চোখে পড়ে না। অবহেলা আমার সহ্য হয় না নক্ষত্র।

তোমাকে অবহেলা করবো কেন?

করবে, করবে। এটাই স্বাভাবিক। দোষগুণ সবার মধ্যে আছে, এটাই মানুষ ভুলে যায়। আজ যে রূপগুণ তোমাকে আকৃষ্ট করছে, কাল তাই দোষ হিসেবে প্রতিপন্ন হবে। জানো, নিকটত্ব দূরত্ব আনে। দূরত্ব কাছে টানে। তুমি যখন দূরে থাকো এক তীব্র চুম্বক-শক্তি কাজ করে। তোমাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে। আবার কাছে এলে আমার স্বপ্নের নক্ষত্র হারিয়ে যায়। তুমি আমার স্বপ্নের নক্ষত্র হয়েই থাকো না কেন, তাতে রাজপরিবারের সবার মঙ্গল।

নক্ষত্র ব্যঙ্গ করেন, এ কথা বললেই তো হয় রাজপরিবারের মঙ্গলের জন্যে তুমি বিয়ে করছো না?

একই কথার সূত্রে ফিরে আসছো কেন নক্ষত্র? তুমি সরাসরি উত্তর চাও, তাই না? তবে শোন, তোমার উচ্ছৃঙ্খল ভালোবাসার জন্যে তোমার বৌ হতে আমার ভয় হয়।

নক্ষত্র এবার ক্ষেপে যান।

এতোই যদি প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে ভাবো তো গোয়ালিয়রের রাজকুমারকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলে কেন?

কলাবতী নির্বিকার বলেন, আমাদের আবার রাজি অরাজি কি? তোমার বোনেদের যেমন বিয়ে হল আমারও তেমনি বিয়ে হতো। লোকটাও ভালো ছিল।

নক্ষত্র নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেন না। প্রায় চিৎকার করে বলতে থাকেন, তা মন্দ হবে কেন, সম্মান আছে, টাকা আছে, মণি মুক্তোয় মাথা থেকে পা অবধি মুড়ে দিত। এ ছাড়া আর কি দিতো শুনি? আমি তো চরিত্রহীন, আমার অনেক সেবাদাসী, ঐ ব্যক্তিটি খুবই চরিত্রবান নাকি? রূপই বা এমন কি ছিল মুগ্ধ হবার মতো?

রূপগুণের কথা কে ভাবছে? আমার বিয়েটা হয়ে গেলে ভালো হতো, সুখে থাকতাম।

তা তো থাকতেই। শুধু তোমাকে নয়, ও তোমাদের সবকটি বোনকে দেখেছে। এ অপমান তুমি সইলে কী করে? ও তো তোমাকে ভালোবেসে নয়, পছন্দ করে বিয়ে করতে চেয়েছিল?

শ..ন্তস্বরে জবাব দিলেন কলাবতী, যদি বলো পছন্দের কথা, সেখানে ভালোবাসাবাসির প্রশ্ন নেই, প্রতারণাও নেই। চরিত্রের কথা যদি বলো, কার কতো সেবাদাসী আছে তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। ওসব তো বাড়ির শোভা। তাছাড়া যেখানে ভালোবাসাই নেই সেখানে এসব নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে কি?

নক্ষত্রের ধৈর্যচ্যুতি হল। আহত বাঘের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন, ঠিক আছে কলি, আমার ভালোবাসা জানিয়ে তোমাকে বিয়ে করতে চেয়ে আমার কর্তব্য আমি করে গেলাম। আমাকে দোষ দেবে না।

নক্ষত্র চলে গেলেন। তার যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে কলাবতীর চোখ ছল ছল করে ওঠে।

যন্ত্রণায় বুকের ভেতরে যদি রক্তক্ষরণ হয়, বহির্গমনের পথ যদি রুদ্ধ থাকে, মানুষের মৃত্যু অবধারিত। কলাবতীর যন্ত্রণা মুক্তির পথ পেলো লেখালিখিতে, শিল্পকলায়। সৃষ্টির আনন্দ তাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলো। বাবামহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের স্টুডিওতে তার বেশির ভাগ সময় কাটে। এচিং, উডকাট, জলরং, তেলরং-এ ছবি আঁকছেন, পছন্দ না হলে ছিঁড়ে ফেলছেন, আবার আঁকছেন। ছবি ঠিক মনের মতো হচ্ছে না দেখলে কবিতা, গান লেখেন বা নিজের চিন্তাধারাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেন।

নক্ষত্রের বিয়ে তার মনে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল তা ধীরে ধীরে ভরাট হতে দেখছেন কলাবতী। নক্ষত্রকে ফিরিয়ে দিয়ে যে দুঃখের অবতারণা হয়েছিল, ভুল করেছেন কিনা ভাবনা ছিল, তা-ও সময়ের পরিসরে প্রলেপের আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেছে। ভাবনাকে লাগাম দিলেন কলাবতী। তার মনে পড়ল কাল সাহিত্য-শিল্পবাসর। যা যা লিখেছেন আজ পর্যন্ত তা থেকে ভালো লেখা বেছে নিতে হবে।

মহারাজ বীরবিক্রমের সভাপতিত্বে সাহিত্য-শিল্পবাসর শুরু হল। রাজপরিবারের লেখিকাদের নানাবিধ লেখা নিয়ে আজ আলোচনা হবে। মহারাজ প্রথম স্মরণ করলেন কবি অনঙ্গমোহিনী দেবীকে। তিনিই ত্রিপুরার প্রথম মহিলা কবি, যিনি বাংলার মহিলা কবিদের অন্যতম বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন। অনঙ্গমোহিনী ছিলেন ত্রিপুরার রূপকার, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রথমা কন্যা। তিনি তিনটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন — কণিকা (১৯০১), শোকগাথা (১৯০৬) এবং প্রীতি (১৯০৭)। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কবি অনঙ্গমোহিনীর কাব্যপ্রতিভার প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিলেন —

ওঁ শান্তিনিকেতন

মাননীয়াসু, বোলপুর

আপনার রচিত 'শোকগাথা', 'কণিকা' উপহার পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আপনার এই কবিতাগুলির মধ্যে কবিত্বের একটি স্বাভাবকি সৌরভ অনুভব করি। ইহাদের সৌন্দর্য্য বড় সরল এবং সুকুমার — অথচ কলানৈপুণ্যও আপনার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ। এই নৈপুণ্য আপনার শেষ কাব্যগ্রন্থটিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে........ আপনার এই কবিত্ব-শক্তির মধ্যে আপনার জীবনের সমস্ত দুঃখ বেদনা সার্থকতা লাভ করুক— এই কামনা।

ইতি - ১৭ই শ্রাবণ, ১৩১৮ শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শোকগাথার 'চিরস্মৃতি' কবিতাটিতে বাকশক্তিহীন স্বামীর আসন্ন মৃত্যুবেদনায় ব্যাকুল অনঙ্গমোহিনীর করুণ আর্তি হৃদয় ভারাক্রান্ত করে—

দিবস রজনী হৃদে জাগে নিতি নিতি
কেবলি বিষাদময় সেই শেষ স্মৃতি।
জন্মশোধ বিদায়ের বিষাদ চুম্বন
যাতনায় ক্লিষ্ট সেই বিবর্ণ বদন।

আকুল বিষাদভরে হাতে হাত রাখি,
চেয়েছিল অশ্রুপূর্ণ প্রভাহীন আঁখি।

....

সমস্ত জীবন মম, প্রভাতে সন্ধ্যায়
শুধু সেই স্মৃতিরেখা হৃদয়েতে ভায়।

অনঙ্গমোহিনী দেবী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় সহমরণে যেতে চেয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা বাতিল হওয়ায় তা সম্ভব হয় নি।

বৈষ্ণব ভাবধারা রাজ-অন্তঃপুরের রানীদের মধ্যে গভীর রেখাপাত করেছিল। এর ফলে তাঁরাও অনেক ব্যঞ্জনাময় কবিতা, সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন, ওদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাধাকিশোর-মহিষী মহারানী তুলসীবতী এবং বীরেন্দ্রকিশোর-মহিষী মহারানী প্রভাবতী দেবী।

মহারাজের আদেশে রেণুকাকুমারী কবিতা পাঠ করেন—

ঘেরি ঘেরি সখী সবে পুলকে মাতিল যবে
আবির কুমকুম দিতেছে শ্যামের অঙ্গে
লালে লাল হল তনু আকুলিত রাই কানু
চূড়া কুণ্ডল হেলে বাজে মোহন বাঁশীরে।
হেরি অপরূপা রাই- কানু রূপ
তুলসীবতী যেন রাঙ্গাপদ হেররে।

(তুলসীবতী)

মহারানী প্রভাবতী দেবীর একটি রাগসঙ্গীত পড়ে শোনানো হল —

ডুবিল আঁখি মোহন মুরতি রসে
সুবেশে সুহাসে শোভিছে রাই শ্যামের পাশে
ফুটিয়াছে হেমলতা যেন নীলগিরি-পাশে
হেরি অতুল শোভা নাচেপ্রাণ প্রেমোল্লাসে।
প্রভাবতী অভিলাষী দেখিতে ও রূপরাশি
নিরমল রূপরাশি দেখ আসি ত্রিপুরাবাসী।

স্মরণিকা শেষ হল। মহারাজ জানালেন, ত্রিপুরার ঘরে ঘরে অসংখ্য মহিলা কবি আছেন যাঁরা প্রচার বিমুখ, পরদার আড়ালে থাকতেই ভালোবাসেন। ত্রিপুরার আকাশে বাতাসে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির বীজ ছড়িয়ে আছে। ত্রিপুরায় এমন একটি

ঘর নেই, যেখানে গানের সুর-লহরী মন মাতায় না। এমন মানুষ নেই যিনি গান জানেন না।

আজকের সাহিত্য-শিল্পবাসর ডাকা হয়েছে, বিশেষ করে কলাবতী দেবী এবং নবীনা দেবীর জন্যে। মহারাজের কানে এসেছে কলাবতীর শিল্পসৃষ্টির গুণগত নৈপুণ্যের কথা। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। পুরো হলঘরে কার্পেটের উপর সুজনী পেতে বসার জায়গা করা হয়েছে। মেয়েরা সব ওখানে বসেছেন। রাজপুরুষদের জন্য পেছনের দিকে চেয়ার পাতা হয়েছে। মহারাজ হেলান দিয়ে একটা কাউচে বসেছেন। সামনে সেন্টার টেবিল। হলঘরের এক কোণে একটি ইজেল রাখা আছে। ছবি প্রদর্শনের জন্যে।

প্রথম ডাক পড়লো নবীনা দেবীর। নবীনা দেবী সম্পর্কে নক্ষত্রের ছোট বোন। অনেকগুলি কবিতা পড়লেন তিনি। যে কবিতাটি সবার ভালো লাগলো সেটি হল —

রিমি ঝিমি রবে ঝরে শ্রাবণের বারি,
আঁধার নিশীথে দূরে ডাকিছে দাদুরি।
ঘন ঘোর কাল মেঘে চমকে বিজুরি,
আকাশ সেজেছে যেন পরি নীলাম্বরী।
উত্তাল তুমুল ছন্দে বহিছে পবন,
তাহারি পরশে শিহরিত বেনুবন।
দুয়ার খুলিয়া দিনু সিক্ত কেশরাশি
যদি বঁধু ফিরে যায় দুয়ারেতে আসি
বাতাস বহিয়া যায় করি হাহাকার
দীপশিখা নিভে যায় ঘনায় আঁধার।

সবাই হাততালি দিয়ে নবীনা দেবীকে উৎসাহিত করলেন। নবীনা দেবী লজ্জিত মুখে সবার অভিনন্দন গ্রহণ করে নির্দিষ্ট জায়গায় বসে পড়েন।

এবার কলাবতীর পালা। কলাবতী উঠে দাঁড়িয়ে কাকে যেন ইশারা করলেন। কয়েকজন মহিলা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি আর কি কি সব একটা ব্যাগে এনে কলাবতীর সামনে রাখলো।

কলাবতী এবার মহারাজের দিকে তাকিয়ে সবিনয়ে বললেন, দাদা মহারাজের অনুমতি হলে আমাকে বক্তব্য রাখতে বলা হোক।

মহারাজ সম্মতি দিলেন।

কলাবতী বলতে লাগলেন, তুচ্ছাতিতুচ্ছ দ্রব্য থেকেও শিল্পকর্ম সম্ভব। ছেঁড়া

কাপড়, শিশি, বোতল, ভাঙ্গা কাঠের টুকরো, খালি কৌটো, বাঁশ, বাঁশের গুঁড়ি থেকে আমি যে শিল্প সৃষ্টি করেছি তার কিছু নমুনা আপনাদের সামনে পেশ করার আর্জি করছি।

কলাবতী একে একে তার শিল্পকর্ম দেখাতে থাকেন। বাঁশ এবং বাঁশের গুঁড়ি দিয়ে পাহাড়ী বুড়ো-বুড়ী, নটরাজ, প্রজাপতি, উড়ন্ত পাখি, দুর্গার মুখ আরো কতো কি! সবাই বিস্ময়ে হতবাক হন। মহারাজা তাঁর আসন থেকে উঠে হাত দিয়ে জিনিসগুলো দেখতে থাকেন। অবাক হয়ে ভাবেন, একি উদ্ভাবনী শক্তি! বাঁশ দিয়ে এমন শিল্পকর্মের চিন্তা কলাবতীর মাথায় কী করে এলো—সপ্রশংস দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস করলেন মহারাজ।

কলাবতী উত্তর দিলেন, ত্রিপুরী সমাজে আবহমান কাল ধরে বাঁশের হাতা, খুন্তি, চামচ, গ্লাস, বাটি, থালা, হুঁকো, টুকরি ব্যবহৃত হয়। আমার শৈল্পিক ভাবনায় আমি বাঁশের কাজকে শিল্প-সুষমামণ্ডিত করেছি মাত্র। অনেক জিনিস সবাই আবর্জনা বলে ফেলে দেয় যেমন ছেঁড়া সুতো, কাপড়, শিশি, বোতল ইত্যাদি। আপনারা দেখুন, জঞ্জাল থেকে আমি টুপি, সোয়েটার, ব্লাউজ এবং তুলোর উপর সুতো দিয়ে পেপার পাল্প থেকে পেপার ওয়েট, কাঁথা কতো কি তৈরী করেছি।

মহারাজ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলেন কলাবতীর দিকে। সমবেত সবার চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি। এ যেন আবিষ্কার। এমন শিল্পকর্ম বাঁশ এবং আবর্জনা থেকে সৃষ্টি করা সম্ভব, এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম অনুভূত হল। সবার প্রশংসা শুনে জীবনকুমারী দেবী কেঁদে ফেললেন। কলাবতী তাঁর দুখী মেয়ে। জিদ্দী মেয়ে। রূপে-গুণে সবার উপরে।

এখানেই শেষ নয়। কলাবতী তার জলরং, তেলরং দিয়ে আঁকা ছবি একের পর এক ইজেলে রাখলেন। প্রত্যেকটা ছবির অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করলেন। শেষ ছবি দেখিয়ে যখন বলতে যাচ্ছেন, সবাই বলে উঠলো, বলতে হবে না। ওটা থাক, নামিও না। আরেকটু দেখি।

ছবির নাম—জেল, বাংলায়—গারদ। ছবিতে কলাবতী নিজের মুখই এঁকেছেন। জানালায় একটি অলঙ্কারে সজ্জিত মুখ। অভিব্যক্তি বিষণ্ণ। চোখদুটি মুক্ত নীলাকাশের দিকে। একটি উড়ন্ত পাখির দুটো ডানা নীলাকাশ দিগন্ত জুড়ে। কলাবতীর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হল না। এ ছবির ভাষা সবাই পড়তে পেরেছেন।

আরো বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে। কলাবতী এবার কবিতা এবং গদ্যরচনা পড়বেন। কবিতা পড়ার আগে একটু ভণিতা করেন।

আমার কবিতা রাবীন্দ্রিক নয়। নিজের মতো করে লেখা। শ্লেষের কবিতা, নাম 'প্রগতি' —

চলতে গিয়ে পড়লাম ফাঁদে
বদলে গেল জীবনটা, মনটা তখন কাঁদে।
কোথায় গেল দেশের বাউল, কোথায় কীর্ত্তনীয়া
মোদের জন্যে রইল শুধু তাদের চোখের জল,
অরকেষ্ট্রা বেজে উঠল, এল নূতন দল।

যাকগে, কি হবে আর ওসব কথা ভেবে
গেলাম দাবা-খেলা ক্লাবে। দেখলাম
অনড় হয়ে আছেন রাজা, নড়বার উপায় নেই
বোড়ের চালে ধরা পড়লেন মন্ত্রী মহাশয়।

রইল কেবল হাতী ঘোড়া, তবু চলছে খেলা
ছলে বলে, আমি দেখছি তা কুতূহলে...,
না, আর যায় না বসা। চললাম যখন বাড়ির পথে
দেখা হল বন্ধুর সাথে, বললেন তিনি
ওরে ভাই, কোথাও শান্তি নাই।

কেন, কী হল আবার, ভাঙ্গল কপাল কার?
বললেন, ধস্তাধস্তিতে ভেঙ্গে গেল ঘর-সংসার
তাই নাকি? ভাঙ্গল কে কার?
চুপ রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন বন্ধুবর
আমরাই ভাঙ্গলাম আমাদের ঘর।

বেশ, বেশ, ওতো খুব ভাল কথা,
নূতন করে গড়তে হলে ভাঙ্গতে হয় নাকি,
একেই বলে 'রিভল্যুসন' - অর্থ হল তার
পরিবর্তন ঘোর পরিবর্তন।
বন্ধু বললেন, মরে গেল যারা, ফিরে ত আসবে না তারা,
হিংসার আসনে বসে শ্মশান রাজত্ব চাইনা
অমঙ্গলে হবে কি আনন্দ স্থাপন?

'রিভল্যুসন' রাখুন, রাখুন ওসব বিদেশী কথা
আমরাই হচ্ছি এখন বলির পাঁঠা।

বললাম ঐ কথাটা মনে ধরল না বুঝি?
পরুন গিয়ে অহিংসার টুপি সোজাসুজি।
বন্ধু বললেন, আপনার কথা আমি শুনছি না
দাবা খেলা ত মোটেও জানেন না।
কোনটা রাজা, কোনটা মন্ত্রী তা-ও বোঝেন না
মন্ত্রীকে বুঝছেন রাজা, বলছেন বাদ পড়ে গেল
খেলা দেখতে দেখতে আপনার সময় বয়ে গেল।

দাবা খেলা খুব মজার খেলা
খেলার নেশায় যায় বয়ে বেলা।
বোর্ডে দেখলাম রাজার মাত্র এক পা
এদিক সেদিক নড়েন চড়েন, আত্মরক্ষা করেন;
মন্ত্রীর সর্বত্র গমন। মাঝে মাঝে বোড়ের চালে
যখন ধরা পড়েন তখন বাদ পড়েন।

রাজাকে করতে হবে বন্দী, চলতে থাকে ফন্দি
দু-একটা বোড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে
মন্ত্রীর স্থানে বসে মন্ত্রী হয়ে যায়, দাপট খাটায়।

আর এক রাজার পিল ক্যাসেল যখন থাকে না
তড়াক করে রাজার সামনে এসে পড়ে ঘোড়া
রাজা পড়ে যান ধরা। দীর্ঘকাল ধরে খেলাটা চলে
শেষ হয় রাজা মাত হয়ে গেলে।
এখন ভেবে দেখ বোড়ের চালটা
কেমন করে মন্ত্রী হয়ে বসল ওটা।
আমার সময় নষ্ট হল বটে, কিন্তু
যারা খেলেন, তারা তামাক টেনে বলেন

'চেক', আত্মরক্ষা কর যদি পার।

রক্ষা করতে চেষ্টা হতে থাকে......
'শেষটায় ড্র হল নাকি খেলাটা?'
তুমি ভাব বসে বসে সেটা
আমি বাড়ি ফিরছি নিয়ে অভিজ্ঞতা
দাঁড়াও দাঁড়াও একটা কথা বলে যাও,
কোনদিন কি খেল নি? মাত করে দাও নি?
খেলেছিলাম, নিজেই মাত হয়ে গেলাম।

হাতী ঘোড়া সবই আছে, রাজাটা আমার নাই
এরি দুঃখে প্রাণটা আমার যায়।
কোন মতে মান রাখছি — মুখে হাসি টেনে
কি আর হবে বল আমার কথা জেনে!

কবিতাটি সবাই খুব উপভোগ করে হাসলেন। মহারাজের মুখে-চোখে শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়। তাঁর বৈমাত্রেয় ছোটবোন অসীম প্রতিভাময়ী। রাজপরিবারের চার দেয়ালের মধ্যে থেকে প্রতিভার এমন বিচ্ছুরণ তাঁকে শুধু বিস্মিত করে নি, শ্রদ্ধায় অভিভূত করেছে।

আদর করে ডাকলেন, কলি!

কলাবতী উত্তর দিলেন, দাদা মহারাজ!

সস্নেহে বললেন বীরবিক্রম, তুই তো খাঁটি সোনা রে। ত্রিপুরার গৌরব। তোর প্রতিভার প্রশংসা করার মতো ভাষা আমার জানা নেই বোন! আশীর্বাদ করি তোর প্রতিভা দিন দিন আরো বিকশিত হোক। আমি যদি কোন সাহায্য করতে পারি জানাতে দ্বিধা করিস না।

তারপর কলাবতীকে কাছে ডেকে তার ললাট চুম্বন করে কেউ যেন শুনতে না পায় এমন ফিস ফিস করে বললেন, সেদিনের ব্যবহারের জন্য আমি দুঃখিত। তবে একটা কথা, তোর প্রতিভার কদর দেবার মানসিকতা নক্ষত্রের নেই। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে করেন।

কলাবতী মাথা নত করে চুপ করে থাকেন।

মহারাজার মনে পড়লো কলাবতীর গদ্যও পড়ার কথা। তিনি বললেন, এক

অসীম প্রতিভার অধিকারী ত্রিপুরার রাজকুলে জন্মেছেন বলে আমরা গর্বিত। এবার তাঁর গদ্য রচনা শোনা যাক।

কলাবতী তার খাতার পাতায় চোখ বুলিয়ে একটা ছোট রচনা বের করে পড়তে থাকেন। নাম- 'প্রাণের সন্ধানী'।

'কে তুমি? এমন নির্জন নিশুতি রাতে বিদ্যুৎদাহ নিয়ে অঝোর ধারায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছ?

তোমার নীলাম্বরীতে রাত্রি যে আরো গাঢ়তর হয়ে উঠেছে! অবগুণ্ঠনের প্রয়োজন ত আর নাই।

দেখি দেখি, ও মুখ একবার ভাল করে দেখি?

হে সজল বরষা, আঁধারে মুখ ঢেকে কেন কাঁদ, সেকি আর ফিরে আসবে না?

তুমি কাঁদ স্মৃতির চমক নিয়ে, আমি কাঁদি নিজেকে খুঁজে খুঁজে, এমনি রাতে হারিয়ে গিয়েছিলাম, আমার প্রাণ মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল সেদিন, সবার দৃষ্টির আড়ালে নিজেকে রেখেছিলাম; আজ তোমাতে আমার অশ্রু উছলে পড়ছে।

তুমি নিরন্তর কেঁদে এসেছ, আমার অশ্রু তোমাতে অফুরন্ত হয়ে থাক, অমৃতময় হয়ে বেঁচে থাক। জানতাম —

জানি, গতানুগতিক ভাবে জলছবির মত সবই মুছে যায়, নিশ্চিহ্ন হয় কিন্তু জেনেছি, মনের নিভৃতে অতীত চুপি চুপি এসে চেতনায় সঞ্জীবিত হয়।

মনে করি ভুলে গেছি, বাস্তবে নিজেকেই ভুলি।

আত্মবিস্মৃতির দরুণ অন্ধকারে বিগতেরা দীপ জ্বেলে দেয়। আলোকিত হয় অন্ধকারে নিমজ্জিত দিনগুলি।

প্রিয়মুখ সব নক্ষত্রের মত জ্বল জ্বল করে আমার দিকে চেয়ে থাকে; আমি থাকি তাঁদের নিবিড় আলিঙ্গনে। ওরা আসে স্বপ্নময় হয়ে, ভাল লাগে ওদের হাসি-গান যদিও বর্তমান আমাকে লুণ্ঠিত করে ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করছে, আমার স্মৃতিতে তারা সম্পদ, আমার পাথেয়। তারা চিরনবীন, চিরমধুর, আমার সবুজ বনের পাখী।

তারা সঞ্জীবিত, আমি স্তব্ধ, তারা আলোকিত, আমি লুপ্ত, (মৃত নই)। নিরন্তর ওদের নিয়ে আছি। স্বস্পন্দনে অনুভব করি তাদের স্পন্দন। আলো-ছায়াঢাকা কাহিনীতে তারা রূপ পাচ্ছে; শিশু বয়সের ঝাপুলিকেও আমি দেখতে পাচ্ছি। তাদের বাদ দিলে চেতনা বিলুপ্ত হয়, নিশ্চল পাষাণ হয়ে পড়ি। মনে পড়ে ঝাপুলির সে সব কবিতা, সঙ্গীত, নূপুর শিঞ্জন। সে স্বর্ণসূত্রে বাঁধা বিহঙ্গিনী। একান্ত আমার পিঞ্জরের পাখি।

সে মহাশূন্যে মিশে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ঝাপুলি, ঝাপুলি সেই কুহকিনীকে

তুমি মায়ার বাঁধনে বেঁধে রাখলে!

আশ্চর্য্য! সে আজো আমার কোলে মাথা রেখে কাঁদে, কিন্তু তুমি, হে বরষা, তাকে সান্ত্বনা দিতে পারলে না, অঝোর ধারায় কেঁদে চলেছে; তাই কি সে আবার নীড় ছেড়ে চলল?'

পড়া শেষ হতেই সবাই সাধু সাধু রবে জয়ধ্বনি করে উঠলেন। সবাই বলাবলি করছেন, আজকের সন্ধ্যা এক অসামান্য অভিজ্ঞতা। মহারাজ বীরবিক্রম নিজের গলার হার খুলে কলাবতীকে পরিয়ে দিলেন। আসর সমাপ্ত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। বিলনীয়ার নিকটবর্তী শহর পূর্ববঙ্গের ফেনীতে জাপানীরা বোমা ফেলেছে। কলাবতীর সঙ্গে সেদিনের ঝগড়ার পর নক্ষত্র ব্রিটিশ আর্মিতে যোগ দিয়েছেন। যুদ্ধের ডাক এসেছে, তাঁকে যেতে হবে। যেদিন যাবে, পরিবারের মধ্যে কান্নার রোল উঠেছিল। মহারাজ বীরবিক্রমের চোখে জল। অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন। লালু কর্তা কী করবেন ভেবে না পেয়ে একটা চেয়ারে ধপ্ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

সবাইকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে নক্ষত্র কলাবতীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মিলিটারী ধড়াচূড়ো পরে এসেছিলেন। বললেন, অনেক আবোলতাবোল বকেছি। ঝোঁকের মাথায় আবার পাগলামি করে বোসো না। আমাকে যেতে হচ্ছে কিন্তু জেনে রেখো আমাকে ফিরে আসতেই হবে। আমার একটা কাজ এখনো বাকি। ফিরে এসে তোমাকে বিয়ে করবো।

কলাবতী ভাবলেন, যুদ্ধে যেতে হচ্ছে বলে বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

হেসে জিজ্ঞেস করলেন, আজ ক'পেগ গিলে এসেছো?

নক্ষত্র বললেন, কাছে এসে পরীক্ষা করে দেখ।

নক্ষত্রের দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে দুষ্টমিভরা চোখে কলাবতী বললেন, তোমার চতুরালি আমার জানা আছে কর্তা!

দুঃখের হাসি হেসে নক্ষত্র বললেন, তা তো জানবেই। আমি বদমাস লোক। জানো, তুমি রাজরানী হলে আমি খুশিই হতাম। শ্যাম্পেন গিলতাম, মজা করতাম। তা যখন হল না, ওটাকে গুরুত্ব দিয়ে অসহযোগ করছ কেন? এর মানে কেউ বুঝুক না বুঝুক আমি বুঝি। ঐ ঐশ্বর্যবান লোকটাকে ভালোবাস নাকি? সে কি তোমার স্বামী?

স্বামী হতে যাবে কেন?

তবে আমার সঙ্গে বিয়েতে অতো আপত্তি কেন?

আপত্তি আছে। এখন আমার মনের অবস্থা ভালো না। অনেক ভাবতে হবে।

আমি অপেক্ষা করবো না, এ তুমি জেনে রেখো। আবার বিয়ে করবোই।

পাঁচটা বিয়ে কোরো, আমাকে কেন বলছো? আমি কি তোমার শোধ তুলবার হাতিয়ার নাকি?

তোমাকে না বললে আমার শান্তি নেই যে। প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছি। এখনো ঐ স্ত্রীকে ভালোবাসি।

তবে আমার স্থানটা কোথায়?

যেখানে কেউ নেই, তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। আমি শান্তি চাই।

ওটা একান্ত মনের ব্যাপার।

আমি জানি।

তাহলে?

তুমিই আমার শান্তি।

এবার কলাবতী বর্তমান প্রসঙ্গে ফিরে আসেন। বলেন, তুমি তো যুদ্ধে যাচ্ছো, আমরাও যাচ্ছি অন্য রাজ্যে। ফিরে এসে তোমার বৌকে নিশ্চয় দেখতে যাবো।

ম্লান হেসে নক্ষত্র বললেন, যে পথ বেছে নিয়েছি, জানি না ফিরবো কিনা? যাবার আগে হোয়াই ডোন্ট য়ু গিভ মি আ বিগ হাগ?

নিবিড় ভাবে কলাবতীকে আলিঙ্গন করে তার কপালে স্নেহচুম্বন এঁকে দিয়ে ছল ছল চোখে বিদায় নিলেন নক্ষত্র। তাঁর পথের দিকে তাকিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠলেন কলাবতী। বুকের মধ্যে যে চাপ অনুভব করছিলেন এতোক্ষণে অশ্রুরূপে তা ঝর্ণার বেগে বেরিয়ে বুকটাকে হালকা করে দিলো। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বললেন, দুর্গা, দুর্গা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের দিকে এগিয়ে আসতেই ত্রিপুরা রাজপরিবারের ছেলে মেয়েদের স্থানান্তরিত করা হচ্ছিলো। আমাকেও যেতে হল। যাবার বেলায় ব্যাকুল হয়েছিল মন। বার বার উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের দিকে পিছু ফিরে দেখছিলাম। একদা ঐ প্রাসাদে অন্তঃপুরটিকে খাঁচা মনে হতো, সেই পিঞ্জরার শূন্য ব্যথায় মন কাঁদছিল। কতো সুখদুঃখের স্মৃতি মগ্ন হয়ে আছে, কতো বসন্ত এসে চলে গেছে। ঐ সোনার খাঁচায় আমি জন্মেছিলাম তা ভুলি কেমন করে? ত্রিপুরাতে জীবন উৎসবময় ছিল। নাটক, বসন্ত উৎসব, দুর্গাপূজা উপলক্ষে কলিকাতা থেকে ষ্টার থিয়েটার আসতো, সিনেমা আসতো। নামকরা ওস্তাদরা আসতেন, সানাই বাজতো। বৈশাখী মেলা

আনন্দরসে থৈ থৈ করতো। আমার দিদিদের দেখেছি একটা গণ্ডীর মধ্যে ওঁরা ছিলেন, বিয়ের পর ত্রিপুরায় এলে নিঃশ্বাস নিতেন যেন। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় ওঁরা কাঁদতেন, সবাইকে ছেড়ে যাবেন বলে নয়, ত্রিপুরাকে ছেড়ে যাবেন বলেই কাঁদতেন।

যুদ্ধের সময় এলাহাবাদ হয়ে নানা দেশ ঘুরে আমাদের আসতে হয়েছিল বারিয়া ষ্টেট-এ। সেই যে এসেছি প্রায় দু বছর হতে চললো। আমরা আছি ছোট দিদি নন্দিনী দেবীর শ্বশুর-বাড়িতে। ত্রিপুরা থেকে অনেকে এসেছেন আমাদের সঙ্গে। কিছু গেলেন টেরী গড়ওয়াল ষ্টেটে, কিছু থেকে গেলেন এলাহাবাদে। এখানে মহারাজকে বাপজী বলা হয়, মহারানীকে বা-সাব। দিদিকে যুবরানী সাব।

শুনলাম এক কালে এ রাজ্য উৎসবময় ছিল। যুবরাজের মৃত্যুর পর থেকে সব বন্ধ হয়ে গেছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু হয় না। এখানকার রাজপ্রাসাদ মন্দ নয়। দিদি ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানে থাকেন। আমরা তাঁর সঙ্গে প্যালেসে আছি। বাপজী থাকেন কম্পান বাঙ্গলোয়, ছোট রাজকুমার হীরা সিংয়ের মহলে। আমাদের সঙ্গে যাঁরা এসেছেন তাঁদের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে পাহাড়কুঠ নামে একটা দোতলা বাড়িতে। থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধে নেই, অসুবিধে হল ভাষার, কিন্তু সবাই এখানে উচ্ছল আনন্দে অবাধ গতিতে আছেন।

এ রাজ্যে বিস্তৃত পোলো-গ্রাউন্ড আছে, অসমাপ্ত সাগরমহল আছে। পার্কের মতো সুন্দর বড় বাগান আছে। ওতে স্থানে স্থানে দেখলাম সাদা পাথরের অনেক মূর্তি। মন্দিরের মতো করে পিলার দেওয়া সাদা পাথরের নির্মিত স্মৃতিসৌধ দেখলাম, ওতে মহারাজের পিতার মূর্তি রাখা হয়েছে। এর চারদিকে সিঁড়ি। অনেক ধাপ ছিল। আমরা মাঝে মাঝে সিঁড়িতে বসে গল্প করি। কোন চেয়ার বেঞ্চ রাখা হয়নি।

এ রাজ্যে গুজরাটি ভাষাতে কথাবার্তা হয়, রাজ্যটি ছোট, সুন্দর সাজানো গোছানো, আমার মন্দ লাগেনি। সুব্যবস্থা আছে। হাসপাতাল, স্কুল, হাটবাজার, গেষ্টহাউস সবই ছিমছাম। পুরান কিল্লায় গরবা হয় দুর্গাপূজায়। রানী, মহারানী, যুবরানী সাব ও ঠাকুরের স্ত্রীরা গরবা নৃত্য করেন। প্রতি বছরই এ নিয়ম পালিত হয়। ছোট ছোট ঘড়ায় আংটি দিয়ে শব্দ তুলে ছোট ছোট লাঠি দিয়ে তাল রেখে পরস্পরের মুখোমুখি চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করা হয়। একটু অমনযোগী হলে লাঠির আঘাত খেতে হবে। হোলীতে বহুদূর হতে ঢোলকে সঙ্গীত শোনা যায় অনেক রাত অবধি। খেলা, নৃত্য রাজবাড়িতে হয় না। যুবরাজের মৃত্যু রাজবাড়ির আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। আমার দুঃখ হয় কৃষ্ণাদিদির জন্যে। অতো অল্প বয়সে বিধবা হয়ে কৃষ্ণাদিদি সব হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছেন।

দিদি সবসময় বাগান নিয়েই সময় কাটান। আমরা আসার পর আমাদের সঙ্গে গল্প করেন, টুকটাক রান্না করেন। সবজি কুটতে ভালোবাসেন দেখলাম। এটা সকালে প্রতিদিনই হয়। আর একটা অভ্যেস জানালার ধারে বিকেল চারটে থেকে প্রায় দুঘন্টা বসেন। বেশ উঁচু এবং লম্বা জানালাটায় পেতলের ঝকঝকে পাইপ দেওয়া ছিল। বসবার জন্য ছিল লম্বা তুলতুলে গদি। মোড়ানো আলমারিতে অনেক বই সাজানো। দিদির বই-পড়ার বাতিক ছিল। ঐ জানালায় যখন বসতেন, দু চার ঘন্টা কথা বলতেন না। চা আসতো, জুড়িয়ে যেতো। আমি একদিন এসে জানালায় ওঁর পাশে বসলাম। যখন চা এলো, বললাম, এক চামচ চিনি দিয়েছি, দু চামচ দিচ্ছি, আবার দিচ্ছি, বলতে বললেন, এ তুই কি করছিস?

আমি নানা প্রকারে দিদিকে খুশি রাখতে চাইতাম। তাঁর সঙ্গে প্রতিদিন চাইনিস চেকার খেলতাম, হারাতাম। কেরাম ভালো খেলেন। আজকাল চাইনিস চেকারেও জিতছেন। এটা আমার সহ্য হবে কেন? মন দিয়ে খেলি।

দিদির একটা লাইব্রেরী আছে। বেশিরভাগই উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের সবকটি উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের বহু বই সাজিয়ে রেখেছেন; কিছু ধর্মের বইও আছে। আমরা দুপুরে শুয়ে শুয়ে বই পড়ি। প্রতিদিন সকালে বিকেলে রাত্রে রেডিওতে শুনি যুদ্ধের খবর, আর দিদির সঙ্গে ঝগড়ার ফন্দি খুঁজি। দিদি এতে বেশ মজা পান।

আমার এই দিদির অনেক গুণ আছে, প্রথম যখন ওঁর হনলুলু গার্ডেনটা দেখি, অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এমন রুচিসুন্দর বাগান কমই দেখেছি। মস্ত বড় চৌকো লেক। পাড়ে বাঁধা একটা ছোট্ট নৌকো, ওতে দুজনে বসে জলখাবার খেয়ে গল্প করা যায়। বারান্দাযুক্ত ছোট ঘর ছিল। এর আশেপাশে ছিল ঝাড়ঝোপ, জংলা ফুল। খুব স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে রাখা হয়েছিল। একটা বেশ বড় গাছ ঘিরে বার তৈরী করা হয়েছে দেখলাম (পান-পানীয় ওতে চলে)।

আমরা সকাল বিকেল রোজ ওই বাগানে যাই। মাঝে মাঝে পার্টি হয়, খাওয়া দাওয়া ওখানেই চলে।

আজকাল আমাদের কিছু ব্যতিক্রম হচ্ছে, অনেকে বেসামাল হয়ে পড়ছেন। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চেষ্টা করেও ঐ স্বাভাবিক অবস্থা আমার হল না। এটা আমারই দুর্ভাগ্য বলতে হবে। মেতে উঠতে পারলাম না। পেছন থেকে কে যেন আমাকে ধরে রেখেছে। আমার সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান সবার অলক্ষ্যে সৃষ্টি হল। দিদি কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। আমার সঙ্গেই সব সময় হাসেন, কথা বলেন। মাঝে মাঝে ককটেল

পার্টি দেন। এমনি করেই আমাদের দিন কেটে যাচ্ছে। একদিন একটা পার্শেল পেলাম। করাচী থেকে নক্ষত্র পাঠিয়েছেন। পার্শেল খুলে দেখলাম, ওতে ছয় বোতল ব্ল্যাক লেবেল হুইস্কি, দু বোতল গর্ডন জিন। শান্তা আপ্তের একটা রেকর্ড ও চিঠি। লিখেছেন অনেক বাজে কথা। যেমন — ইলার সঙ্গে তাঁর বনিবনা হচ্ছে না। ইলা তাঁর জীবনে রাহু। মোদ্দা কথা, আমাকে বিয়ে করতে চান। আসল খবরটা হল, করাচী থেকে আরাকান সীমান্তে বদলি হয়েছেন। জাপানী এবং আজাদ হিন্দ ফোর্সকে রুখতে হবে। ইতি-র আগে লিখেছেন — বন্দেমাতরম । জানিয়েছেন, আজাদ হিন্দ ফোর্সের সঙ্গে যুদ্ধ করার বিন্দুমাত্র বাসনা তাঁর নেই।

দিদিকে দিলাম হুইস্কি, জিন, চিঠিটাও পড়ে শোনালাম। দিদি বিরক্ত হয়ে বললেন, হুইস্কি-জিন পাঠিয়েছো বেশ করেছো। আমি রাজপুতের বৌ, ক্ষত্রিয়ানী, ড্রিঙ্কের জন্যে ধন্যবাদ নিশ্চয় দেবো। আবার রেকর্ড, চিঠি কেন? ন্যাকাকান্নাই বা কেন? এসব শান্তিনিকেতনী ঢং বুঝলে?

দিদির রাগ দেখে না হেসে পারি নি। হেসে হেসেই বললাম, চল, আজই একটা পার্টি দেবার ব্যবস্থা করে হেলথ্ ড্রিঙ্ক করি। পরে কিছু প্রেজেন্ট পাঠানো যাবে।

দিদি সায় দিয়ে কাকে যেন ডেকে পাঠালেন বন্দোবস্ত করার জন্যে।

ছোট দিদির জন্যে আমার দুঃখ হয়, ওই তো আমার কৃষ্ণাদিদি। ও যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ি থেকে এল, আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলেছিল, ওমা তুই তো খুব সুন্দরী হয়েছিস? তোর হাইট কিন্তু আমার চেয়ে কম।

তাঁর সঙ্গে আমার ভাব তেমন জমে ওঠেনি, কিন্তু ভাব যখন জমলো, না এলে বলেছে, তুই যে এলি না।

কৃষ্ণাদিদি খুব কম কথা বলেন। তাঁর হাসিটা খুব সুন্দর বলে দাবি করেন। তাঁর অপ্রিয় ব্যবহার আমি ভুলেছিলাম। সে আমাকে খুশি করার জন্য যখন সেন্ট, সিগারেট কেস, চোলী-সদরী দিল— সেন্ট নিলাম, চোলী-সদরী নিলাম না। একসময় সবার জন্যে সে তাঁর দেশের জামা কাপড় পাঠিয়েছিল, আমাকে বাদ দিয়ে। আজ এই দিদিই দিচ্ছে আমাকে, তা নিতে না দেখে তাঁর চোখে-মুখে দুঃখের ছাপ ফুটে উঠতে আমি তক্ষুনি সেন্ট, সিগারেট ব্যাগে পুরে কাপড়গুলো নিয়ে ড্রেসিং-রুমে গেলাম। আমার কাণ্ড দেখে দিদি চোখ মুছে ছিলেন। সিগারেট টানতে দেখে হেসে বলেছিলেন, আমি তো চলেই যাবো। রোজ আসবি।

দিদি এলে ভিড় জমে। নক্ষত্রও মাঝে মাঝে আসে। যেতাম না ভালোবাসে না বলে। আমার সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল। সব ব্যাপারে আমাকে পিছিয়ে রাখতে চাইতো। সেই যখন বলছে কেন আস না, একটু অবাক হলাম বৈকি! আমিও কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করলাম। আমার এই দিদিটি যখন ২১ বৎসর বয়সে বিধবা হল, কালো পাড় সাদা শাড়ী পরে এল, সেদিনের কথা ভাবলে আমার মন অস্থির হয়। দীর্ঘজীবন এমন নিরানন্দে কাটবে নাকি? আমার প্রিয় পিসিমাও বার বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, সেই পিসির জীবন-কথা অত্যন্ত দুঃখের। সারাটা জীবন দুঃখ ভোগ করে অন্তিম জীবন শেষ করেছেন। দিদির জীবনও স্বামী-সন্তানশোকে মুহ্যমান হল। কোন বোনের জীবনই সুখের হল না একমাত্র রেণুকা ছাড়া। তাঁরও স্বামী মারা গেল। সব বোনের কপালেই দেখছি বৈধব্যযোগ আছে।

বারিয়াতে প্রতিবছর কার্তিক মাসে দু মাসের জন্যে গুরু মহারাজ স্বামীজী গঙ্গেশ্বরানন্দ মহারাজ স্ব-শিষ্যদের নিয়ে থাকতেন। এ বছরও তিনি আসছেন। তাঁদের অভ্যর্থনা করে আনতে আমি ও মা অন্যদের সঙ্গে গিয়েছিলাম।

আমাদের ত্রিপুরাতেও সচ্চিদানন্দ স্বামী, কালানন্দ স্বামী (মাতৃসাধক), দাওজী মহারাজ, সড়ানন্দ স্বামী, সন্তদাস বাবা, যশিডির হংস মহারাজ, গৌরগোবিন্দ গোস্বামী এবং আবো অনেকেই মাঝে মাঝে আসতেন। শকুন্তলা রাস্তায় বড় বড় গাছ ছিল, দীঘির পাড়ে জগন্নাথ মন্দির। জটাধারী বৈষ্ণব সাধুরা ধুনী জ্বেলে বসতেন। তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ হোতো। আমি তুলসীদাসের রামায়ণ থেকে যা শুনেছি না লিখে পারছি না।

শ্রীরাম খুব উঁচু পর্বতে দাঁড়িয়ে দূরবীক্ষণে রাজধানী লঙ্কা দেখছিলেন। তিনি নীল ঘন মেঘে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখেন। মেঘগর্জন শোনেন। বিভীষণ বলেন, এ মেঘগর্জন নয়, বিদ্যুৎও নয়। নীল সামিয়ানা ওটা, পাখোয়াজ বাজছে, মহারানী মন্দোদরীর কানের দুল চমকাচ্ছে। আজ উৎসব পালন করছেন লঙ্কেশ্বর রাবণ। এ কথা শুনেই লক্ষ্মণ তীর ছুঁড়লেন, মহারানী মন্দোদরীর কানের দুল পড়ে গেল। সকলে আশ্চর্য হন, অশুভ লক্ষণ অনুভব করেন; থেমে গেল পাখোয়াজ। রাম ও সুগ্রীব, হনুমান বিস্মিত হয়েছিলেন।

আমি যে কিছুই ভুলি না। এমন অনেক কাহিনী রামায়ণ, মহাভারত গ্রন্থে শুনেছি, পড়েছি, যা আমাকে আলোড়িত করে। আমি সাধু সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আত্মসমর্পণ করি না।

মহারাজ মণ্ডলেশ্বর আসার পর আমাদের ছোট বোনেরা ও ত্রিপুরার অনেকেই তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। আমাকে দীক্ষা নিতে বলা হলে বললাম, আমার গুরু আমার ভেতরেই আছেন।

দিদির অনুগতা এক ভক্তিমতি বললেন, ক্ষিধে পেয়ে শিশু কাঁদলে মা এসে দুধ খাওয়ায়। আপনি গুরুকৃপা প্রার্থনা করলে ঈশ্বরের কৃপালাভ হবে।

এর কথায় বিরক্ত হয়ে বললাম, ভক্তি-বিশ্বাস খুব সহজ নাকি? আমার ক্ষিদে পায় নি, কাঁদবো কেন?

মণ্ডলেশ্বর ও তাঁর প্রধান শিষ্য সর্বানন্দজী আমার কথা শুনে হাসছিলেন। কিন্তু দিদি মুখ ভার করে রইলেন। আমার মা বললেন, এর অপরাধ নেবেন না।

ভজন হল, উপাচারে পুজো হল। মহারাজ আমাকে ডাকলেন, আমি তাঁর কাছে গেলাম, তিনি আমাকে মালা পরিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মহারাজ ছোটবেলা থেকে অন্ধ, আমার চেহারা দেখতে পান না, মন বোধহয় দেখতে পান। মহারাজকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি তাঁর ব্যবহার।

এবার গরমের সময় সন্ন্যাসী মহারাজ কেদার-বদরী যাবেন। আরো অনেকেই যাবেন তাঁদের সঙ্গে। মা-র একান্ত ইচ্ছেয় আমিও যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। মা-র লোকজন সবাই যাবে। আমার লোকজনও কম ছিল না।

প্রথমে আমরা পৌঁছলাম হরিদ্বার। চৈত্রমাস, হাওয়া বইছিল। গঙ্গা উদ্দাম স্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সবাই আমরা হর কি পৌড়িতে স্নান করলাম। আমাদের সঙ্গে দুজন পাণ্ডা ছিল। তাঁরাও আমাদের সঙ্গে কেদার-বদরী যাবে।

হরিদ্বারে গঙ্গার দু পাড়ে দুটি বিচিত্র জগৎ দেখা যায়। একদিকে লোকবহুল জনতার ভিড়, বেচা-কেনার ব্যস্ততা। কোথাও নাচগান হচ্ছে খঞ্জনীতে, ছোট ছেলেরা বাঁশী বাজাচ্ছে, কোথাও প্রবচন, বেদ পাঠ হচ্ছে, কীর্তন হচ্ছে। জ্যোতিষীদের ভাগ্য-গণনায় ব্যস্ত দেখা যায়। রাজনীতির বক্তৃতা থেকে ভোজবাজী, লাঠিখেলা কিছুই বাদ নেই। অন্য পাড়ে শ্যামকান্তি নীলাপর্বত যেন ধ্যানমগ্ন। তার উচ্চ চূড়ায় দেখা যায় মনসাদেবীর মন্দির। সেখানে সর্বত্র শ্যামের স্নিগ্ধ ছায়া, প্রকৃতি যেন শ্যাম-প্রেমে বিভোর। গেরুয়াধারী বৈরাগী সন্ন্যাসীরা সে স্থানে থাকেন। এই নীরব শান্ত ভূমির নাম কংখল। পথের দুধারে গোলমোহর সুনহার বৃক্ষে ফুল ফুটে আছে। ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে দিয়ে গঙ্গা ছুটে চলেছে। ত্যাগের শান্তি, ভোগের সুখবিলাস, হাসিকান্না, বিপত্তি তার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি, দিবারাত্রি ছুটছে, বিরামহীন তার যাত্রা, উচ্ছল তার গতি। আমার

মনে হল ধনী-গরীব, শিশু-যুবা, বৃদ্ধ সবাই একই সঙ্গে মহাপ্রস্থানের পথে চলেছি।

সোনার কমল ভাসিয়ে দেয়ার মধ্যে অভিমান ছিল কি? ছিল কি চোখের জল? যার নামে ফুল ভাসিয়ে দিলাম, আশা ছিল তাঁকে মনে পড়বে ফুলের সুবাসে। যে মনের কথা বিশেষ বলে গেল না, কাঁদালো দূর থেকে তাঁর জন্য ভাসলো সোনার কমল। অমূল্য রত্নসম যা ধারণ করে সেজেছিলাম, আজ তা ভাসিয়ে দিলাম। কোথায় গিয়ে পৌঁছবে জানি না, একটা ক্ষীণ আশা মনে রয়ে গেছে যেন।

ময়ূরকণ্ঠী নামটাও বেশ। কত রং কত বৈচিত্র ছিল ঐ নদীতে। উষার রাঙ্গা আলো, বনের সবুজ ছায়া, রূপসী বধূর রূপলাবণ্য, বেলাশেষে সন্ধ্যাতারা দেখা যেত নিশ্চয়।

শুনলাম, হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকলো। চমকে উঠলাম। অনেক অনেক দূর থেকে কার ডাক শুনলাম? যাকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছিলাম সেই আমায় ডাকেনি তো? ভেবেছিলাম অনন্ত শয্যায় শুয়ে থাকবে, এখন বুঝতে পারছি ঘুমের ভান মাত্র ছিল। বুঝলাম, সে ঘুমোয় নি। ডাকবে ডাকো, আমি আর পেছন ফিরে তাকাবো না।

গঙ্গাস্রোতে জোনাকীর মতো কত শত প্রদীপ ভেসে যাচ্ছে, কোনটা অর্দ্ধপথে যেতে যেতে নিভে গেল, কোনটা বাঁক নিচ্ছে। শত শত ফুল-অর্ঘের আলোর মিছিল গঙ্গাতরঙ্গে ভেসে গেল। গঙ্গারতি স্তবগান শুনছি — জয় জগদীশ হরে। কে যেন আবেশভরে নিবিড় করে তাঁর বিশাল বুকে আমাকে টেনে নিল। আমি বিবশ হয়ে পড়েছিলাম, মাথা রাখলাম তাঁর বুকে। শুনতে পাচ্ছি হৃদয়ের ক্রন্দন।

আমিও ফুল, প্রদীপ ভাসিয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে জীবনটাও ভেসে গেল। সবার নিকট হতে সে আমায় কেড়ে নিল যেন। সবার ভালোবাসা ব্যর্থ করে দিয়ে আমাকে কাঙ্গাল করলো। আমি সকলকে হারালাম। সবাই বলছে— এ বিধির বিধান! আজ বলছি — তুমি কি আমায় নিয়েছিলে? তবে কেন পথের ধূলায় ফেলে দিলে? বাঞ্ছিতভাবে কেন এলে না? কেন লাঞ্ছিত করলে? জীবন-যৌবন ব্যর্থ হল।

লিখছিলাম হরিদ্বারের এপারের কথা, কি লিখতে কি লিখলাম। আমি কী করি— একটা পাথর বুকজুড়ে বসলে এমন হয়।

হরিদ্বারে পনেরো দিন ছিলাম, আবার যাত্রা শুরু হল। সাধু-সন্ন্যাসী সহ শতাধিক যাত্রী ছিলাম। ঋষিকেশ, লছমনঝোলা, দেবপ্রয়াগ হয়ে কেদারে পৌঁছলাম। যাত্রীর বিরাম-বিশ্রাম নেই, চলার আনন্দেই চলে। কেদারে একদিনের বেশি থাকা যায় নি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, বরফে ঢাকা ঘরবাড়ি। পুরো স্থানটাই বরফে ঝলমল ছিল, ভয়েরও কারণ

ছিল।

কেদারে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে স্তূপাকার আকৃতিতে। এখানে নাকি নরনারায়ণ তপস্যা করেছিলেন।

কেদারে রাত কাটিয়ে তার পরদিন আমরা চললাম বদরীর পথে। পৌঁছলাম প্রায় দশদিনে। পথের কোন কষ্টই কারুর কষ্ট মনে হল না। সবার সঙ্গে মন্দিরে গেলাম, দেখলাম কালো প্রস্তরফলকে চতুর্ভূজ মূর্তি কর্পূর চন্দনে লিপ্ত। জীবন্ত বলে মনে হল। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কেদারনাথও আছেন। পরিপাটি করে পীতাম্বর পরানো। হীরা পান্নার মুকুট ঝলমল করছে, মুক্তোমালা, হীরা-হারে ঐশ্বর্যময় ঈশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন।

নিরাকার প্রস্তরফলককে রূপ দিয়ে মানুষই শ্রদ্ধা-বিশ্বাসে প্রণাম করে। নিজের রুচিমতো ঐশ্বর্য্যময় ঈশ্বরকে সাজায় নানা অলঙ্কারে। ভগবান নিয়ত প্রত্যক্ষ, স্পর্শিত মনে হয়। বিশ্বনাথ যিনি, সর্বদা স্পর্শিত হয়ে আছেন। মা-র কোলের শিশুর মতো আমরা আছি; কিন্তু ঐ মূর্তিকে দূর থেকে প্রণাম করতে হয়। অগণিত মানুষের ভালোবাসার প্রতীককে প্রণাম করলাম। তুমি প্রভু, আমি দাসী, আমার চক্ষু তোমায় দেখতে চায়। আমি তুমি এক হতে চাই না। চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালোবাসি। ভালোবাসতে চাই, ভালোবাসা পেতে চাই।

সকলের মত কেন আমি হতে পারছি না? অন্ধ মহারাজ, সন্নাসী মণ্ডলেশ্বর অন্ধভাবেই আমাকে ভালোবাসতেন। আমাকে একটা ছোট্ট মেয়ে মনে করতেন। যখন গাইতাম— কিস ঔর গয়ে শ্যাম সখি....... চোখ বুজে বিরহ-সঙ্গীত অনুভব করার চেষ্টা করতেন। মহারাজ পছন্দ করতেন—মেরে তনকে তু অধিকারী - কমলা ঝরিয়া গেয়েছিলেন, আমি নিজের ভাবে গাইতাম।

সন্ন্যাসীদের মধ্যে শাস্ত্রীজীকে আমার ভালো লেগেছিল। উনি মূর্তি-বিরোধী ছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনি গেরুয়া পরতে গেলেন কেন?

বলেছিলেন, আমি যে কতোবার গেরুয়া ছেড়েছি তার হিসেব নেই। সর্বানন্দজীর পীড়াপীড়িতে গেরুয়া পরতে হয়েছে। তাছাড়া গেরুয়ার একটা মাহাত্ম্য আছে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে।

বললাম, আপনাদের মধ্যে কী নিয়ে অতো তর্ক হয়? আপনি রাগেন কেন?

শিব নামে একটা পাথরের উপর দুধ ঢালার কোন মানে হয়? ওটায় আমার আপত্তি। তর্ক হয়ে যায়।

আপনি ভগবান বিশ্বাস করেন না?

করি, তবে শালগ্রাম শিলা ভগবান এ আমি বিশ্বাস করি না।

আমি হেসে বললাম, ভগবান সর্বময় স্বীকার করলে, শালগ্রাম শিলা বাদ পড়বে কেন? কিন্তু আমি আত্মা, আমার কোন সুখ-দুঃখ নেই, আমি নির্বিকার, এ আমি মানি না।

শাস্ত্রীজী খুব হাসলেন। ঐসব কথা বিশ্বাস করতে নাকি সাধনা করতে হয়। আমি তো অল্পবয়স্কা মেয়েমানুষ মাত্র। ছাড়বার পাত্রী নই আমি। বললাম, আমি তো দেখছি আপনাদের শিষ্য-শিষ্যারা অন্ধবিশ্বাসে, কেউ গেরুয়ার প্রভাবে, কেউ পরজন্মের অজানা ভয়ে, কেউ ইহলোকের শান্তিসুখের আশায় দীক্ষা নেন, শিক্ষা নেন কি? সত্যি বলুন তো ওরা কী পায়?

শাস্ত্রীজী বললেন, সান্ত্বনা পায়, নির্ভরস্থল পায়, দুঃখের কথা বলতে পারে, সৎ উপদেশ পায়। গুরুকে একান্ত আপন ভেবে ভক্তি-বিশ্বাসে শান্তি পায়, বিশ্বাস স্থাপন করে নিশ্চিন্ত হয়।

বললাম, অমৃতের সন্ধান পায় কি? ওরা নিজেদের ভক্তি-বিশ্বাসে শান্তি পায়। আপনারা কী দেন, পাথরে বীজমন্ত্র ছড়ালে কি ফসল হবে?

শত শত ছড়ানো বীজের একটিরও ফসল হবে না বলছেন?

সবটাই হতো যদি জমিটা আগে তৈরী করতেন।

আমরা কি তা করি না?

করেন। তবে তা প্রকৃতি-বিরোধী। আমার মতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ছাড়বার নয়, প্রশ্রয় দেবারও নয়, শিক্ষার দ্বাবা সংযম অভ্যেস করতে পারি মাত্র। এটাই মানবধর্ম, মানুষের আত্মসমর্পণ, নিবেদন ওসব আমি বুঝি না। কার কাছে আত্মসমর্পণ করবো বলুন?

মানবধর্ম তো বললেন, পারেন তা রক্ষা করতে? রোজই দেখি রাগ করে কাপ-ডিশ ভাঙ্গছেন। মানবধর্ম রক্ষা করার জন্যই তো আমাদের সাধনা, শিক্ষা, দীক্ষা।

খেতে পাই না একাদশী করছি, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করা হয় সংসার থেকে পালিয়ে, রাগ ত্যাগ করি মৌনী হয়ে, আমি এসবকে বলি প্রকৃতি-বিরোধী।

না গো না, যাকে আপনি প্রকৃতি-বিরোধী বলছেন মানুষের তা আসলে স্বভাব-

বিরুদ্ধ। জন্মের সময় আমরা স্বভাবে থাকি। তারপর থেকে আয়ত্ব করতে থাকি রজো এবং তমোগুণ। এরাই আমাদের প্রকৃতি গঠন করে। স্বভাবে মানুষ সচ্চিদানন্দ। অভ্যাসযোগ দ্বারা স্বভাবে ফেরা যায়। তাই আমরা মন্দিরে সেবা-পূজাদ্বারা, জনসেবা দ্বারা, স্নানাদি নিত্যসেবা দ্বারা, কর্ম, পাঠ, ভজন দ্বারা জীবন পরিচালনা করার অভ্যেস করে শিক্ষা, দক্ষতা লাভ করি। কাম, ক্রোধ, অহংকারকে বশীভূত করার চেষ্টা করি।

গুণগ্রাহী মন ফুলের সৌরভ-সৌন্দর্যকে অস্বীকার করতে পারে কি?

না তা অস্বীকার করি না, আমরা তা শ্রদ্ধা করি।

কিন্তু সকলেই শ্রদ্ধা করেও মুগ্ধ হয়, বার বার রূপ দেখতে চায়, তা আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

অস্বীকার করি না, জগদীশ্বরের সুন্দর সৃষ্টি দেখে আনন্দ বোধ করি। আপনি ফুল তুলে মালা গেঁথে আপনার কিশোরীলালকে পরিয়ে দেন না?

আমি তো সন্ন্যাসী নই, আমার বাসনা-কামনায় সুন্দরকে ভালোবেসে পরিয়েছি।

শত ভালোবাসলেও ছাড়তে হয়, এই প্রকৃতির নিয়ম। আমরা তাই উদাসী সন্ন্যাসী। ভালোবাসি, ভালোবাসা অস্বীকার করি না।

কথা বলতে বলতে আমরা কংখলে পৌঁছে গেলাম। বলা হয়নি, আমরা হরিদ্বারে ফিরে এসেছি বেশ কিছুদিন। গুরু মহারাজকে দর্শন করে ফিরে যাবো। যাবার আগে মহারাজের কাছে বসলাম। যে প্রশ্ন সবার মনে তা আমার মনেও জাগে। জিজ্ঞেস করলাম, ভগবান আছেন?

তিনি বললেন, আমার শিষ্যকে জিজ্ঞেস করো।

সর্বানন্দজী সবসময় মহারাজের কাছে থাকেন, তিনি মহারাজের পাশেই বসেছিলেন, প্রশ্ন শুনে তিনি মাথা নাড়লেন। আমি মহারাজকে বললাম, সর্বানন্দজী 'না' বলছেন।

গুরু মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন, কেন 'না' বলেছেন জানো? আছে বললে তুমি নেই বলতে, তর্ক করতে, তাই নেই বলে 'আছে' বলতে চেয়েছেন।

তাই নাকি? বেশ তো, আমি 'আছে' বলছি তবে সবার অনুভূতিতে নেই।

যদি থাকেন আমার-আপনার সবার মধ্যেই আছেন। ভগবান এক, অদ্বিতীয়, শাস্ত্রে তাঁকে এ ভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সর্বানন্দজী স্মিতমুখে বললেন।

বললাম, আছেন অনন্তশয্যায়। যা আছে তা নেই হতে পারে না। যা নেই তার কথা-ই ওঠে না। তবে এতো প্রশ্ন কেন?

প্রশ্ন তো আমি করি নি। প্রশ্ন আপনার। আপনি নিজেই চিন্তা করে মীমাংসা করুন,

ভগবান আছেন কি নেই? 'ঈশ্বর' এই নামটি এল কোথা থেকে? কখন থেকে? ভেবে দেখুন।

দর্শন বলেছে, ঈশ্বর জগন্ময়। প্রথমে মানুষ প্রথম বীজ অনুসন্ধান করেছে, আত্মবোধে অবশেষে ঈশ্বর অভিন্ন ও এক যে বলেছে, তা কল্পিত রূপ নয় তো? এই সংশয়ে পড়েছি।

মহারাজ বললেন, তা বৈ কি! তুমি মহাকবির রূপ নিয়ে আমার পাশে বসে আছো, তিনি আছেন, তুমি আছো। আমি যে কাউকে দেখি না। আমি অন্ধ তুমি তা জান, তোমাকে দেখতে পাই না, তা বলে কি তুমি নেই?

আপনি আমায় না দেখলেই বা কি, আমার মাথায় হাত বুলোচ্ছেন, আমার কথা শুনছেন, এমন করে ভগবানকে কেউ ছুঁয়েছে?

সর্বানন্দজী বললেন, আপনি নিজেকে কখনো দেখেছেন?

আয়নায় দেখেছি।

শরীরই দেখেছেন, ব্যক্তিত্ব, চৈতন্যময়কে দেখেন নি।

শরীর-ক্রিয়াতে চৈতন্য প্রকাশ পায়, সকল অবয়ব নিয়ে আমি। কিন্তু যখন গান গাই বা ছবি আঁকি একাগ্রতায় সামনে দিয়ে কেউ চলে গেলেও দেখি না। তখন বুঝি, মনই বিষয় গ্রহণ করে। শরীরের মধ্যে এই আমি কি মন?

মহারাজ এবার কথার খেই ধরলেন। বললেন, জানো মা, তর্কের খাতিরে তর্ক নয়। প্রাচীন ঋষিরা নেতি নেতি করে অস্তি-তে পৌঁছেছিলেন। ভগবান কী, কেউ মুখে বলতে পারবে না। যিনি তাঁকে দেখেছেন তিনিও বলতে অক্ষম। গীতাতে ভগবানের বিশ্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু ভগবান কি বর্ণিত হয় নি। ভগবান বিশেষ্য - একটি নাম। তুমিও বিশেষ্য। যে তোমাকে কোনদিন দেখে নি তাকে বোঝাতে তোমার রূপ-গুণের বর্ণনা করতে হবে। কিন্তু ও বর্ণনায় সম্পূর্ণ তুমি কোথায়? আমরা বিশেষণ দিয়ে বিশেষ্যকে ধরবার চেষ্টা করি, কিন্তু বিশেষ্য তো অধরাই থেকে যায়। আমরা বিশেষণকেই পুজো করি। বিশেষ্যকে নয়। বিশেষণ যেহেতু বিশেষ্যের অংশ অতএব পুজো বিশেষ্যেরই হয়। বিজ্ঞানও বিশেষ্যকে বিশ্লেষণ করতে পারে না। ব্রহ্ম যদি চৈতন্য হয় তাকে বিশেষণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা বাতুলতা। কারণ চৈতন্য-রূপ গুণাতীত। যখন আমি বলি ভগবান আছেন, তার মানে এই নয় তিনি সশরীরে আছেন। তিনি সর্বভূতাশয়স্থিতঃ। তিনি সাকার আবার নিরাকার। ভক্তের চোখে তিনি সাকার তাই তাঁর মূর্তি গড়া হয়, সাজানো হয়, পুজো হয়। কারণ ভক্ত ভগবানকেও নিজের মতো

করে পেতে চায়। জ্ঞানীর চোখে ভগবান নিরাকার। আবার তান্ত্রিকের মতে ভগবান মাতৃ, শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে বর্তমান। ভগবান আছেন কি নেই বৃথা তর্ক না করে সত্ত্বগুণের সাধনা কর। আছেন কি নেই তখন তুমিই বলতে পারবে। কাউকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না। তুমি ভগবানকে ছুঁতে চাও, তাই না? চৈতন্য জাগ্রত হলে শুধু ছোঁয়া নয়, এ খাঁচার ভেতর তাঁকে নিরন্তর অনুভব করবে। এ আমার অভিজ্ঞতা, উপলব্ধির কথা বললাম মা! মানা না-মানা তোমার ওপর নির্ভর করে।

গুরু মহারাজের কথা শুনে বিমোহিত হলাম। বুঝলাম, ছেলেমানুষী সত্ত্বেও তিনি ঈশ্বর-তত্ত্ব ব্যাখ্যার উপযুক্ত আধার ভেবেছেন আমাকে।

বললাম, আমার মনে যে শান্তি নেই।

মহারাজ হেসে বললেন, শান্ত হলেই শান্তি পাওয়া যায়।

আমি যে শান্ত হতে পারি না, তাহলে উপায়?

উপায়—নিরুপায়। নিরুপায় না হলে উপায় মেলে না। দেখলে না, দ্রৌপদী নিরুপায় হয়ে যখন বস্ত্র ছেড়ে দুহাত তুলে কৃষ্ণকে ডাকলেন তখন কৃষ্ণ না এসে পারলেন না।

সেদিন মহারাজকে প্রণাম করে চলে এলাম। গুরু মহারাজ, শাস্ত্রীজী, সর্বানন্দজী আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। আমার উপর তাঁদের সহানুভূতি, মমত্ববোধ আছে। আমার জীবনের অনেক কথাই তাঁরা জানেন। আমি যে কতো অসহায়, নিঃসঙ্গ, তা তাঁরা জানতেন না। আমি তীর্থপথ হতে অনেক অনেক দূরে চলে এসেছি। সে পথের দৃশ্যাবলী অ্যালবামের পাতার মতো এক একটা করে উল্টে যাচ্ছে। আর দেখছি একটা মেয়েকে, যার বয়স তেইশ চব্বিশ, সে খেয়ালখুশিমতো হেসে গেয়ে বেড়াতো, গতি ছিল চঞ্চল। সুস্থির থাকার অবসর কাউকে দিতো না। কিছু দয়ামায়াও ছিল, ছিল ব্যঙ্গ-কৌতুক। ডুবন্ত মাঝিকে ডাঙ্গায় তুলে নিতে দ্বিধা করতো না। হাওয়া মহল ভেঙ্গে দিতে এক মুহূর্ত দেরি হতো না। আমি আজ দেখতে পাচ্ছি তাকে, সে অনেক ধাপ নীচে নেমে গিয়েছিল। তার প্রভু তাকে দুহাতে তুলে নিতে চেয়েছিলেন। তাঁর ডাক শুনতে পেয়েও সাড়া দেয়নি সে। সে অনেক দূরে চলে গেছে, আজ কাউকে আমার বলতে পারছে না, অথচ কিশোরীলালকে সে ফুল, চন্দন, মালা দিয়ে বিয়ে করেছিল।

মহারাজকে এতো বিচলিত দেখাচ্ছে কেন? মহারানী কাঞ্চনপ্রভা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

মহারাজ বীরবিক্রম বিষণ্ণ হেসে বললেন, মহারানী, আমাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে।

কিছু বুঝতে না পেরে কাঞ্চনপ্রভা মহারাজের দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মুখ দিয়ে শুধু অস্ফুট শব্দ বেরলো, কী?

বীরবিক্রম হাসলেন। এ হাসিতেপ্রাণ নেই। গোধূলির আকাশের মতো ম্লান।

এতো বুদ্ধিমতি হয়েও বুঝতে পারলে না? শোন তবে, আমিই বোধহয় ত্রিপুরার শেষ মহারাজা।

হেঁয়ালি ছেড়ে আমাকে সব কথা খুলে বলুন মহারাজ! আমি আপনার কথার কোন অর্থই বুঝতে পারছি না।

বিধির লিখন পড়তে পারছো না মহারানী? ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে ঠিক করেছে। গান্ধীজী-র ক্যুইট ইণ্ডিয়া, অসহযোগ আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লব, নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফোর্স ব্রিটিশ সিংহের ভিত্তিপ্রস্তর কাঁপিয়ে তুলেছে। নৃপতি সম্মেলন কেন হয়েছিল জানো? ভারতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তন সম্পর্কে আমাদের সম্মিলিতভাবে কী করা উচিৎ তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। আলোচিত হয়েছিল যদি ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয় তাহলে আমাদের কী করণীয়। বড়লাট বলেছিলেন, সার্বভৌম শক্তি দেশীয় রাজ্যদের সঙ্গে সন্ধির শর্তসমূহ পালন করে বলে এটা ঠিক নয় যে, রাজারা রাজ্যের মঙ্গলের দিকে মন দেবেন না। প্রজারা অসন্তুষ্ট হলে, ন্যায়সঙ্গত অধিকার না পেলে রাজ্য টিকতে পারে না, এ কথা আমি নৃপতি সম্মেলন হবার আগেই বুঝতে পেরে ১লা নভেম্বর ১৯৩৮ সালে জনসাধারণের অবগতির জন্যে এক রোবকারী প্রচার করেছিলাম।

এতটা বলার পর বীরবিক্রম হঠাৎ স্মৃতিমন্থনে ডুবে যান। কাঞ্চনপ্রভার অস্তিত্ব ভুলে তিনি অতীতে অবগাহন করতে থাকেন। কাঞ্চনপ্রভা মহারাজের ভাবগম্ভীর

মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর চিন্তার সূত্রে ব্যাঘাত না ঘটাতে নিশ্চুপ হয়ে যান। গিভ হিম আ স্পেস। হি নিডস নাউ আ স্পেস। বীরবিক্রমের অজান্তে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কাঞ্চনপ্রভা। ভাবনাগ্রস্ত রাজাকে বিরক্ত করতে নেই। বীরবিক্রম টের পেলেন কিনা বুঝতে পারলেন না।

১৯২৩ সালে পিতা বীরেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হলে যুবরাজ বীরবিক্রম কিশোর ১৫ বছর বয়সে সিংহাসনের অধিকারী হন। সেই সময় তিনি নাবালক থাকায় তাঁর পক্ষে শাসন-পরিচালনার জন্যে একটি শাসনপরিষদ গঠিত হয়। ১৯২৮ সালে ২৯শে জানুয়ারী ২০ বছর বয়সে শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী মহাসমারোহে তাঁর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়।

বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য রাজ্যাভিষেকের পরই রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হন। চিত্তবৃত্তির দিক থেকে এক আধুনিক মননশীল পুরুষ বীরবিক্রম। সিংহাসনে আসীন হবার এক বছরের মধ্যে কুমিল্লার আঞ্জুমান-ই - ইসলামিয়া মহারাজকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন (৮ই ভাদ্র ১৩৩৫ বাং)। প্রত্যুত্তরে তিনি যে প্রতিভাষণ দিয়েছিলেন তা নিয়ে এখনো চর্চা হয়।

'আমি আজ সরলভাবে আপনাদের বলিতেছি, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি আবহাওয়া আমার রাজ্যে সৃষ্টি করা—ইহাই আমার সর্বোচ্চ এবং একমাত্র আকাঙক্ষা। যাহাদিগের ভাগ্য আমার নিজের ভাগ্যের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত—হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, আমি তাহাদিগকে এই বুঝাইয়া দিতে চাই যে, বিভিন্ন জাতিতে-জাতিতে অথবা বর্ণে-বর্ণে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্যের স্থান নাই। প্রতি সম্প্রদায় একই আদর্শ, লক্ষ্য এবং পরিণতির নিয়মে সুনিয়ন্ত্রিত। আমি চাই, হৃদয়ের অন্তঃস্থলের অনুভূতির দ্বারা প্রত্যেকে এইটুক উপলব্ধি করুক যে, ধর্ম কেবলমাত্র পন্থা বিশেষ—যাহার অনুসরণেই একমাত্র সার্ব্বজনিক গন্তব্যগৃহে আমরা বিশ্বপিতার পদপ্রান্তে উপনীত হইতে পারি। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, যিনি ফেজ ব্যবহার করেন তিনি ফেজই এবং যিনি পাগড়ী ব্যবহার করেন তিনি পাগড়ীতেই অনুরক্ত থাকুন, কিন্তু আমি চাই প্রতি মানবের প্রাণ এই অনুভূতিতে স্পন্দমান হউক যে, দৃশ্যমান বৈষম্য কেবলমাত্র বহিরাবরণেই পর্যবসিত, এই বৈষম্যের অন্তরালে মানবাত্মা সাম্য ও মৈত্রীর অনুপ্রেরণায় পরস্পরের নিকট পূজা ও প্রণয়ের দাবী রাখে।...... আজ আমি এক রাজভক্ত হিন্দুর তত্ত্বাবধানে রাজ্যস্থ অপরাপর জাতি-

বর্ণের কল্যাণের ভার সমর্পণ করিতে পারিতেছি, আমার সেই কাঙ্ক্ষিত দিনে আমার আদর্শ- বিশ্বাসী একজন মুসলমানের সেবাতৎপর তত্ত্বাবধানেও সমভাবেই আমার রাজ্যস্থ হিন্দু প্রজার ভার আমি হৃষ্ট চিত্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।'

পরবর্তীকালে মন্ত্রী-পরিষদে ও প্রিভি কাউন্সিলে একাধিক মুসলমান সদস্য নিয়োগ করে মহারাজ তাঁর মুক্তমনের পরিচয় দিয়েছিলেন।

সিংহাসনে বসার পর স্বস্তিতে রাজ্যশাসন করা সম্ভব হয়নি। ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্মুখীন হন। ভারতীয় গণ-আন্দোলনের ঢেউ ত্রিপুরাকেও আঘাত করে। ত্রিপুরার যে সব ছাত্ররা কুমিল্লা কলেজে বা অন্যত্র উচ্চশিক্ষার জন্য যেতেন তাঁরাই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে ত্রিপুরায় ফিরে গোপন সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নিতেন। ১৯২৭ সালে অনুশীলন সমিতির সদস্যরা ছাত্রসংঘ এবং পরের বছর যুগান্তর দলের সমর্থকরা ভ্রাতৃসংঘ নামে সংগঠন গড়ে তোলে। শরীরচর্চা এবং সমাজ-সেবামূলক কাজে লিপ্ত থাকায় বীরবিক্রম যুব সমাজকে উৎসাহ দেন এমনকি পুরস্কার দেবার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভ্রাতৃসংঘের উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে স্বাধীনতা-দিবস পালিত হলে প্রশাসন সতর্ক হয়ে ওঠে। কিছু ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়। একে একে মাতৃসংঘ, মিলন সংঘ নামে সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। তবে এই সব সংঘ ত্রিপুরা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করলেও তেমন বেগ দিতে পারে নি।

১৯৩৭ সাল থেকে ত্রিপুরায় গণ-আন্দোলন জোরদার হয়। রাজনৈতিক টানাপোড়নে রাজ্যের তখন টাল-মাটাল অবস্থা। ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি রাজার অধীনে দায়িত্বশীল শাসনের দাবিতে গণ-আন্দোলন শুরু করে। বীরেন দত্ত, বংশী ঠাকুর, প্রভাত রায়, সুকুমার ভৌমিক, কীর্তি সিংহ, নলিনী সেনগুপ্ত, উষারঞ্জন দেববর্মা, নিমাই দেববর্মা জনমঙ্গল সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন, রাজশাসন উচ্ছেদই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়া গোপন সূত্রে জানলেন ত্রিপুরীদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট চিন্তাধারার বীজ রোপণ করছেন দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বীরেন দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা। ত্রিপুরা রাজ্য গণ পরিষদ তাদের প্রথম দলিলে বিশ দফা দাবি উত্থাপন করে। প্রধান দাবিগুলো এইরূপ—

১) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে রাজ্যে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্তন করতে হবে।

২) সাম্প্রদায়িক নির্বাচনপ্রথার বদলে যুক্ত নির্বাচনপ্রথার প্রবর্তন করতে হবে।

৩) মহাজনী ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে সরকারী কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন এবং অল্প সুদে

কৃষিঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) শহর ও গ্রামে রাস্তাঘাট নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে হবে।

৫) রাজ্যের সর্বত্র দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করতে হবে।

৬) বন আইন সংশোধন করে প্রজাদের পারিবারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিনা মাশুলে সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৭) তাই তুং প্রথা বিলুপ্ত করতে হবে।

৮) বকেয়া খাজনা মকুব করতে হবে।

৯) মহাজনের ঋণের দায়ে যে সব সম্পত্তি হস্তান্তর হয়েছে তা ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০) সভা-সমিতির মাধ্যমে প্রজাদের মতামত গঠনের স্বাধীনতা দিতে হবে।

আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্যের পক্ষে এসব দাবি উপেক্ষা করা বা এর বিরুদ্ধে দমননীতি চালানো সম্ভব ছিল না। বিশেষত যেখানে বৃটিশ সরকার প্রজাদের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। জনমঙ্গল সমিতি এবং ত্রিপুরারাজ্য গণ-পরিষদ দুটি পৃথক মঞ্চ থেকে একই ধারায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করায় মহারাজ রাজ্যে আইনসভা গঠন এবং গ্রামমণ্ডলী স্থাপনের ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় আন্দোলনকারীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়। নানারকম দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে।

ত্রিপুরা রাজ্য গণ-পরিষদ গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন এবং পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে যুবকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। শচীন্দ্র লাল সিংহ উত্তেজক বক্তৃতা দেবার অপরাধে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হন। সুখময় সেনগুপ্ত হরিজন কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করেন। শহর উন্নয়নের নামে রামনগরের মুসলিম পরিবারগুলিকে উচ্ছেদ করার বিরুদ্ধেও আন্দোলন হয়। এর ফলে গণ-পরিষদের অধিকাংশ প্রথম সারির নেতারা রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হন।

একদিকে ত্রিপুরার রাজনৈতিক গণ-আন্দোলন, অন্যদিকে বৃটিশ সরকারের ক্রমাগত অভিযোগ। অভিযোগ — ত্রিপুরা সরকার বিপ্লবীদের প্রতি সংবেদনশীল। ত্রিপুরা রাজ্যে সশস্ত্র বিপ্লবীদের আস্তানা অথচ মহারাজ তাদের বন্দী করার কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না। বিপ্লবীদের প্রতি ত্রিপুরার মহারাজাদের নৈতিক সমর্থন ছিল। ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন রাজ- অন্তঃপুরে সারাদিন কীর্তন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দিয়ে

রাজপরিবারে রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানও হতো। বৃটিশ সরকার বারবার মহারাজকে সতর্ক করেছে এবং নিষিদ্ধ প্রচার-পুস্তিকার তালিকা পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দিয়েছে কিন্তু মহারাজারা নির্বিকার ছিলেন। কুমিল্লার পুলিশ পিস্তল চুরির সন্দেহে দুজন বিপ্লবীকে আটক করার জন্যে ত্রিপুরার সোনামুড়া অঞ্চলে প্রবেশ করলে মহারাজা বীরবিক্রম তার আগেই ঐ দুজনকে নিজ লোকজনের সহায়তায় পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে নিরাপদে আগরতলায় নিয়ে আসেন।

এত দুঃসময়ের মধ্যেও একটাই স্বস্তির কারণ ত্রিপুরার প্রজা-বিদ্রোহ কখনো রাজা বা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। বিদ্রোহের কারণ রাজকর্মচারীদের উচ্ছৃঙ্খলতা। নৃপতিমণ্ডলের (চেম্বারস্ অফ প্রিন্সেস) বিরুদ্ধে যে প্রজা-পীড়নের অভিযোগ তা গঠিত হবার আগেই প্রজামঙ্গলের জন্য ১লা নভেম্বর ১৯৩৮ সালে বীরবিক্রম এক রোবকারী প্রচার করেন—

'সম্প্রতি ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রী মহারাজ মাণিক্যবাহাদুর রাজকর্মচারীর ও জনগণের জ্ঞাতার্থে নিম্নলিখিত রোবকারী প্রচার করেন—

যে প্রকার তন্ত্রদ্বারা রাজ্য শাসিত হউক না কেন, কর্তব্য পরায়ণ কর্মচারীমণ্ডলী না থাকিলে রাজ্যে সুশাসন হওয়া সম্ভবপর নহে। রাজ্য, প্রজা তথা রাজ্যের সর্বপ্রকার প্রজামঙ্গল রাজকর্মচারীর উপর নির্ভর করে। কর্মচারী বর্গের মধ্যে যাহারা রাজ্য সুপরিচালনার চেষ্টা, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তৎপরতার সহিত সুবিচার সাধন, আপনাদিগকে প্রজাগণের অভিভাবক, উপদেশক ও সেবক মনে করেন এবং নিয়ত রাজ্য ও রাজ্যের মঙ্গলকামনায় নিরত থাকেন একমাত্র তাহারাই কর্তব্যপরায়ণ ও সৎ রাজকর্মচারী বলিয়া সকলের বিশ্বাসভাজন ও আদৃত হইবেন। ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বদা কর্মকুশলতা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং তার তুল্য বিবেচ্য অন্যান্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্মচারী-নিযুক্তির ব্যবস্থা বহু কালাবধি আছে এবং অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের সহিত তুলনায় এই রাজ্যশাসনের আদর্শ ও বিধি-বিধানাদি এতদিন পশ্চাদপদ ছিল বলিয়া ধারণা হয় না। কিন্তু এক্ষণে বৃটিশ ভারতের অনেক রাজ্যের মধ্যেও অবস্থার পরিবর্তনে এ রাজ্যের রাজকর্মচারীদের রাজ্য পরিচালন-প্রণালী সময় অনুপযোগী হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এতোদিন রাজকর্মচারীদের মধ্যে বিশেষতঃ নিম্ন কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ নানাহ কারণে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রলোভিত হইয়া নিজ নিজ কর্তব্যপালনে অসমর্থ হইতেছে বলিয়া এ পক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে। অধুনা বৃটিশশাসিত ভারতের অনেকটা স্বায়ত্ত শাসন-প্রণালীর সময়োপযোগী পরিবর্তনের সৎচেষ্টা হইতেছে। তাহার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া ত্রিপুরার রাজকর্মচারীগণ মূল উদ্দেশ্য করিয়া ত্রিপুরায় শাসন প্রণালীর

প্রকৃত বা অলীক অপবাদ অচিরে অপসারণ করিবেন বলিয়া এ পক্ষ আশা করেন।'

মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্যের শাসন-সংস্কার এবং প্রজাসাধারণের জন্যে নানা কল্যাণপ্রদ বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনের আকাঙক্ষা এই মহারাজের প্রজা হিতৈষণার মহৎ প্রয়াসের দিকটি সাধারণ প্রজাদের কাছে গ্রহণীয় হয়েছিল। তাই 'ঢাকা প্রকাশ' সংবাদপত্র ত্রিপুরার প্রজাদের উদ্দেশে লিখেছিলেন —

'আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজাবর্গের উদ্দেশেও কয়েকটি কথা বলা সমীচীন মনে করিতেছি। রাজ্যের সর্ববিধ কল্যাণসাধন কেবলমাত্র রাজারই উপর নির্ভর করে না। প্রজাগণের আন্তরিক সদিচ্ছার উপরই তাহা নির্ভর করে বেশির ভাগ। এজন্য রাজা ও প্রজাবর্গের মধ্যে সর্ববিষয়ে সহযোগিতা স্থাপন একান্ত আবশ্যক।'

সে-সময় গভীর নিরাশার মধ্যেও ত্রিপুরা রাজ্যে যে আশার আলো প্রজ্বলিত হয়েছিল তার আলোকে সমগ্র ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ উদ্ভাসিত হয়েছিল বলা যায়। বীরবিক্রম গর্বিত বোধ করতে পারেন—সেদিন প্রজাদের জন্যে যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, চেম্বার অফ প্রিন্সেস বা নরেন্দ্রমণ্ডল তা সর্বতোভাবে গ্রহণ করেছিল।

রাজ্য জুড়ে আন্দোলনের মধ্যেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত মহারাজ বীরবিক্রম ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ বেশ কয়েকবার পরিভ্রমণ করেছিলেন। ইতালির ফ্যাসিষ্ট নেতা মুসোলিনী, জার্মানীর নাৎসী নেতা হিটলার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। বিদেশের নানা স্থান ভ্রমণ করে তিনি আধুনিক জগৎ সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বিদেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে এক স্বপ্ন রাজ্যে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। কৃষির উন্নতির জন্যে তিনি বিশেষ ব্যবস্থা নেন। পার্বত্য প্রজাদের জুমচাষের পরিবর্তে হালচাষে উৎসাহিত করেন। এ জন্য কিছুটা জমি সংরক্ষিত রাখা হয়। মৌখিকভাবে জমি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রতি মহকুমায় উন্নয়ন বিষয়ক নগর সমিতি ও পূর্তবত্ম সংক্রান্ত উন্নয়ন সমিতি গঠন করেন। সিংগার বিলে বিমান বন্দর তৈরী হয়। গ্রামের উন্নয়নের ভার গ্রামমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আগরতলাকে পরিকল্পিত শহর হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে সরকারী অনুমোদন ছাড়া পাকা বাড়ি নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়। আগরতলার ট্রেজারীতে ব্যাঙ্ক স্থাপন ছাড়াও আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা ষ্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। তিনি বিদ্যাপত্তন নামে একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে আগরতলায় একটি গ্রামীণ

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন। বিদ্যাপত্তনের পরিকল্পনা অনুযায়ী এমন একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে চাইছেন যার অধীনে থাকবে সাধারণ ডিগ্রী কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, কৃষি, চারুকলা ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এ জন্য আগরতলা শহরের পূর্বপ্রান্তে কলেজ টিলায় জমিও নির্দিষ্ট করা হয়। শুধু তাই নয়, রাজপরিবারে রাজভাতার অপব্যয়কেও তিনি রোধ করতে বদ্ধপরিকর।

রাজ্যজুড়ে অস্বস্তিকর পরিবেশ। এ সময় রাজ্য ছেড়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু কবিগুরুর আহ্বানকে অবহেলা করার মতো ধৃষ্টতা বীরবিক্রমের পক্ষে সম্ভব নয়। বংশপরম্পরায় ত্রিপুরার মহারাজারা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গুণগ্রাহী, স্নেহধন্য। বীরবিক্রম তাঁর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের মতো রবীন্দ্রনাথের একান্ত ভক্ত। তিনিই তো রবীন্দ্রনাথকে 'ত্রিপুরার কবি' আখ্যা দিয়েছেন। তখন তাঁর বয়েস তেইশ মাত্র। ১৯৩১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর কবির ৭০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক শিল্পপ্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করা হয় টাউন হলে। কলিকাতার সুধীবৃন্দের তরফে মহারাজ বীরবিক্রম এই শিল্পপ্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করে উদ্বোধনী ভাষণে বলেন —

'আপনারা আমাকে এই মহাযজ্ঞের হোতৃপদে বরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন........ শিল্পপ্রিয় ত্রিপুরা রাজবংশের উপর কবির প্রভাব সামান্য নহে। পক্ষান্তরে গিরি-নির্ঝরিণীশোভিতা, বন-পুষ্পভূষিতা শ্যামলা পার্ব্বতী ত্রিপুরার স্বভাবসৌন্দর্য গোবিন্দমাণিক্য প্রমুখ আমার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্তিকলাপ, ত্রিপুরার সঙ্গীতচর্চা, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্র ও বয়নশিল্প মহাকবিকেও আকৃষ্ট করেছে, ইহাতে ত্রিপুরাবাসী মাত্রেই গৌরবান্বিত।...... আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি স্বার্থঃপরের ন্যায় মহাকবির সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধেরই উল্লেখ করিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাঙলার কবি— ভারতের কবি— বিশ্ব কবি। আমি তাঁহাকে 'ত্রিপুরার কবি' বলিয়া অর্ঘ্যপ্রদান করিতেছি।'

বিশ্ববরেণ্য কবিকে ত্রিপুরার কবি বলে পরমাত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধেছিলেন বীরবিক্রম। কবির আমন্ত্রণে রাজ্যের বিদ্রোহ-বিঘ্ন সময়েও শান্তিনিকেতনে এসে সেই পরমাত্মীয়তার রূপটি আবার হৃদয়ে অনুভব করলেন। ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৯-অপরাহ্নে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে কবি সম্বর্দ্ধনা জানালেন বীরবিক্রমকে। আবেগমথিত, করুণাঘন, স্নেহাসক্ত সে ভাষণ —

'আজকের এই অস্তোন্মুখ সূর্যের মতোই আমার হৃদয় আমার জীবনের পশ্চিম দিগন্ত থেকে তোমার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ বিকীর্ণ করছে।

তোমার সঙ্গে আমার এই মিলন আর একদিনকার শুভ সম্মিলনের আলোকেই

উদ্দীপ্ত হয়ে দেখা দিলে। সে কথা আজ তোমাকে জানিয়ে দেবার উপলক্ষ্য ঘটলো বলে আমি আনন্দিত। তখন তোমার জন্ম হয়নি, আমি তখন বালক। একদা তোমার স্বর্গগত প্রপিতামহ বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁর মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কেবল আমাকে এই কথা জানাবার জন্যে যে তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিতে চান। দেশের কাছ থেকে এই আমি প্রথম সমাদর পেলুম।

আজ একথা গর্ব করে তোমাকে বলবার অধিকার আমার হয়েছে যে ভারতবর্ষের যে কবি পৃথিবীতে সমাদৃত, তাঁকে তাঁর অনতিব্যক্ত খ্যাতি-মুহূর্তে বন্ধুভাবে স্বীকার করে নেওয়াতে ত্রিপুরা রাজবংশ গৌরবলাভ করেছেন। তেমন গৌরব বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের কোন রাজকুল আজ পর্য্যন্ত পাননি।

আজ তোমার আগমনে সেদিনকার সুখস্মৃতির দক্ষিণ সমীরণ তুমি বহন করে এনেছো। আজ তুমি বর্তমান দিনকে সেই অতীতের অর্ঘ্য এনে দিয়েছো। এই উপলক্ষ্যে তুমি আমার স্নিগ্ধ হৃদয়ের সেই দান গ্রহণ করো যা তোমার পিতামহদের অর্পণ করেছিলুম, আর গ্রহণ করো আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ।'

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর স্বল্পকাল আগে ত্রিপুরার রাজদরবার থেকে যে 'ভারত ভাস্কর' মানপত্রটি পেয়েছিলেন তার প্রত্যুত্তরে মহারাজ বীরবিক্রমের রাজোচিত গুণের কথা স্মরণ করে তাঁকে ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় করে গেছেন। ১৯৪১ সাল। রায়পুরার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পীড়িত হাজার হাজার সহায়সম্বলহীন মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে যখন এ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন, উদারচরিত বীরবিক্রম এই বিপন্ন মানবতার সেবায় তাঁর রাজকোষ মুক্ত করে দেন। মহারাজের এই রাজোচিত সৌজন্যে সারা ভারতবর্ষে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। মৃত্যুকবলিত রবীন্দ্রনাথ হুইল চেয়ারে বসে 'ভারত ভাস্কর' উপাধি আম্রকুঞ্জে গ্রহণ করেন। তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'আমার আনন্দের একটি বিশেষ কারণ ঘটেছে যখন বুঝলেম বর্তমান মহারাজা অত্যাচারপীড়িত বহু সংখ্যক দুর্গতিগ্রস্ত লোককে অসামান্য বদান্যতার দ্বারা আশ্রয় দান করেছেন। তার বিবরণ পড়ে আমার মন গর্বে ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারলুম তার বংশগত রাজ-উপাধি আজ বাংলাদেশের সর্বজনের মনে সার্থকতর হয়ে মুদ্রিত হল। এর সঙ্গে বঙ্গলক্ষ্মীর সকরুণ আশীর্বাদ চিরকালের জন্যে তাঁর রাজকুলকে শুভ শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত রাখলো। এ বংশের সকলের চেয়ে বড় গৌরব আজ যখন পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠলো ঠিক সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে রাজহস্ত থেকে আমি যে পদবী ও অর্ঘ্য পেলুম তা সগৌরবে গ্রহণ করি।........ আজ আমার দেহ দুর্বল, আমার

ক্ষীণকণ্ঠ সমস্ত দেশের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর জয়ধ্বনিতে কবিজীবনের অন্তিম শুভকামনা মিশ্রিত করে দিয়ে মহা-নৈঃশব্দ্যের মধ্যে শান্তি লাভ করুক।'

কবিগুরুর আশীর্বাদধন্য মহারাজ বীরবিক্রম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ত্রিপুরায় শরণার্থীর আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে নববর্ষের বার্তায় এক রোবকারী প্রচার করেন।

নং ২৪৬ ১/১/৫১

রোবকারী

'দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ-হাইনেস মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে.সি.এস. আই. এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১লা বৈশাখ।

অভাবনীয় ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ফলে আজ যে সব আশ্রয়হীন নরনারী, বালক, বৃদ্ধ এ রাজ্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছে, আজ এই নববর্ষে মনুষ্যোচিত সমবেদনার সহিত তাহাদের কথা স্মরণ করিতেছি এবং আমি আশা করি তাহারা সকলেই অচিরে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় সুস্থিত হইবে। এই প্রাচীনতম ত্রিপুরা রাজ্যের পবিত্র ইতিহাস চিরদিন অসাম্প্রদায়িকতা গৌরবে উজ্জ্বল এবং ত্রিপুরেশ্বরগণের জাতি-ধর্মনির্বিশেষে বিপন্নকে আশ্রয়দানের পুণ্য কাহিনীতে পরিপূর্ণ। আমার প্রাতঃস্মরণীয় পূর্বপুরুষ রাজর্ষি গোবিন্দ মাণিক্য কর্ত্তৃক প্রবল প্রতাপান্বিত মোগলসম্রাট ঔরংজেবের কোপভাজন সাহ সুজাকে আশ্রয়দান সর্ব্বজনবিদিত ঐতিহাসিক ঘটনা।

অদ্যাপি কুমিল্লার সুজা মসজিদ আমার মহিম্ন পূর্ব্বপুরুষের উদার-আশ্রিত বাৎসল্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। সর্বদা, সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে আমার বংশপরম্পরাগত এই আশ্রিত সংরক্ষণরূপ কুলধর্মকে গ্লানিমুক্ত রাখিতে আমি দৃঢ়সংকল্প।

এই বৃহৎ মানব-সমাজের সকল বিপন্ন ও আশ্রয়প্রার্থীই আমার দৃষ্টিতে সমান। ব্যবহার-ক্ষেত্রে এই সমতা-রক্ষার্থে আমি এবং আমার গভর্ণমেন্ট চির-সচেতন।

এ রাজ্যের সর্বসাধারণকে তাহাদের চিরন্তন সদ্ভাবের মহান ঐতিহ্য স্মরণ করাইয়া আজ নববর্ষে আমি তাহাদিগকে ঐক্য ও প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

বর্তমানে এ রাজ্যের আশ্রিত অসংখ্য দুর্গতকে সেবা-সাহায্য ও সান্ত্বনাদানে এবং নানা প্রকারে উহাদের অবস্থার উন্নতি-বিধানে হিন্দু-মুসলমান প্রজাবর্গের এই মনুষ্যোচিত আচরণে গর্বিত। জগদীশ্বর আমার সর্বশ্রেণীর প্রজা ও আশ্রিতবর্গের মৈত্রী ও শুভ বুদ্ধিকে অক্ষয় করুন ইতি।'

এই প্রসঙ্গে ইউনাইটেড প্রেসের সর্বজনবিদিত পরিচালক ও সম্পাদক শ্রী বিধুভূষণ সেনগুপ্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্তকে লিখেছেন—

'All roads lead to Tripura now and all eyes are directed towards its wonderful ruler with reverence and love. Tripura has done a miracle and has exorted the admiration of the whole country. May the flag of Tripura fly aloft for all time to come......... I am afraid, you all are extremely busy with his Highness who is personally succoring the Daridra Narayan.'

এই সময় ত্রিপুরাতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। এই পরিপ্রেক্ষিতে মহারাজ বীরবিক্রম কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কথা ঘোষণা করেন এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে এই ঘোষণা অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনতন্ত্র বা ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন নামে এক শাসনতন্ত্র রচিত হয়। এতে স্থির হয় যে রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিল মন্ত্রণাসভা হিসেবে শাসন ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে রাজাকে উপদেশ দেবে। খাস আদালত বা হাইকোর্টের উন্নতিবিধান করা হবে। প্রধানমন্ত্রী ও অনধিক চার মন্ত্রী নিয়ে একটি মন্ত্রী-পরিষদ গঠন করা হবে, যার হাতে প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য এবং বাজেট আলোচনা ও তৎ সম্পর্কে অভিমত দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থাপক সভা গঠন করা হয়। রাজ্যের সর্বত্র পল্লী অঞ্চলের কতিপয় গ্রামের সমবায়ে গ্রাম্যমণ্ডলী বা গ্রাম্য ইউনিয়নসমূহ গঠিত হবে এবং প্রতি গ্রামের অধিবাসী কর্তৃক নিজ নিজ মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড নির্বাচিত হবে। এই বোর্ডসমূহ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পরিচালনা, নির্দেশিত কর আদায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারক্ষমতা প্রাপ্ত হবে। ভারপ্রাপ্ত উপযুক্ত অর্থ মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে নতুন প্রণালীতে রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসেব ও অডিটাদি কার্য নির্বাহ হবে। এবং মহারাজের নিজ পরিবারের বাজেট রাজ্যের বাজেট থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে রাজ্যের আয়ের শতকরা দশ অনুপাতে ব্যয় হিসেবে ধার্য হবে।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ ত্রিপুরার রাজ-পরিবারে গভীর শোকের ছায়া নেমে এলো। চার পুরুষের পরম আত্মীয়তাকে ছিন্ন করে বিশ্ববরেণ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধরাধাম ত্যাগ করলেন। মুহ্যমান সারা রাজ্যে শোকদিবস পালিত হল। বীরবিক্রম শোকাতুর কণ্ঠে বললেন, 'ত্রিপুরা তার চার পুরুষের পরম হিতৈষী বান্ধবকে হারালো। এমন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবারই

জন্মগ্রহণ করেন।'

পরমাত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যথায় রাজ-পরিবারে কান্নার রোল উঠলো। ত্রিপুরার মানুষ শোকে বাকরহিত। রবীন্দ্রনাথকে ত্রিপুরা কতো আপন করে নিয়েছিল মূক শোকমিছিলে তা প্রতিভাত হল। ত্রিপুরা রাজ্যে রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হয়।

মন্ত্রী পরিষদ অফিস

চত্বারিংশ ভাগ, বিশেষ সংখ্যা

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ

মেমো নং ১

অতীব শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করা যাইতেছে যে গত ২২শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার বেলা ১২.১০ মিনিট সময়ে কলিকাতা নগরীতে জগদ্বরেণ্য, অমর ঋষি, বঙ্গমাতার বরপুত্র বিশ্বকবি মনীষী ডক্টর - ভারতভাস্কর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ এ রাজ্যের ও জমিদারীর অফিস, আদালত ও বিদ্যালয়াদি যাবতীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান এক দিবস বন্ধ রাখিবার জন্য শ্রীশ্রী যুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। অতএব সদরের অফিস, আদালত ও বিদ্যালয়াদি আগামীকাল ২৫শে শ্রাবণ, রবিবার এবং মফঃস্বলস্থ অফিস, আদালত ও বিদ্যালয়াদি এই আদেশ পূর্বাহ্নে প্রাপ্ত হইলে সেই দিবস এবং অপরাহ্নে প্রাপ্ত হইলে তৎপর দিবস বন্ধ থাকিবে। ইতি সন ১৩৫১ ত্রিং ২৪শে শ্রাবণ।

শ্রী ত্রিবেণীকান্ত গুপ্ত	শ্রী রাণা বোধজং
সেক্রেটারি, মন্ত্রী পরিষদ	সভাপতি, মন্ত্রী পরিষদ
১৪/৪/৫১ ত্রিং	৯/৮/৪১ ইং

এর পরের ইতিহাস বীরবিক্রমের লজ্জা ও কলঙ্কের ইতিহাস। রাজদ্রোহের প্রথম প্রকাশ রিয়াং বিদ্রোহ। যদিও মহারাজেব কর্তৃত্ব তারা অস্বীকার করে নি তবু মহারাজের মনোনীত রায়কাঞ্চনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল তার দায় এড়াতে পারেন না মহারাজ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হতে অর্থনৈতিক সংকট ত্রিপুরার পার্বত্য এলাকায় জুমিয়া কৃষকদের নিদারুণ আঘাত করে। খাদ্যহীন বস্ত্রহীন এই জুমিয়াদের উপর চলে মহারাজের মনোনীত রায়কাঞ্চনদের (সর্দার) পাশবিক অত্যাচার। রায় ও চৌধুরীরা দরিদ্র রিয়াংদের

কাছ থেকে জরিমানা এবং অন্যায়ভাবে অর্থ আদায় করতো। তারা রিয়াংদের নিজেদের জমিতে এবং অন্যান্য কাজকর্মে বেগার খাটাতো। মহারাজের কাছে নালিশ গেল রতনমনির নেতৃত্বে রিয়াংরা সংঘবদ্ধ হয়েছে। সৈন্যদলে তারা যোগ দেবে না। রিয়াংরাও রায়-চৌধুরীদের অত্যাচারের কথা প্রতিকারের আশায় রাজাকে জানালো। ফল হল না বরং অত্যাচার বেড়েই চললো।

রতনমনি ছিলেন নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। রতনমনির বাড়ি পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় মহকুমার রামচীরা গ্রামে। তিনি অনেক তীর্থাদি ভ্রমণ করেন। ধর্মপ্রাণ সাধু হিসেবেই তাঁর পরিচিতি। রতনমনি ত্রিপুরায় এসে বিলোনীয়া মহকুমার বগাফা অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। রতনমনি আসলে ধর্মপ্রচারক সাধু ছিলেন। তাঁর অনেক শিষ্য ছিল। রতনমনির কণ্ঠে একাধিক রুদ্রাক্ষ ছিল। শিষ্যগণ একটি করে রুদ্রাক্ষ ধারণ করতো। তিনি 'ওঁ প্রাণ রাম' বলে হরিনামের মন্ত্র দিতেন। ধার্মিক সাধু রতনমনি পশ্চাদপদ রিয়াংদের নতুন ধর্ম ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

মহারাজের কাছে নালিশ করে কোন প্রতিকার না পেয়ে রতনমনি রায়-চৌধুরীদের বিচার এবং সাজার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলেন। মহারাজের সৃষ্ট অত্যাচারী রায়-চৌধুরীদের বিরুদ্ধে বদলা নিতে মন্ত্রি-পরিষদ এবং সাত হাজার নোযাতিয়া ও বারো হাজার রিয়াং সৈনিক-সংগঠন তৈরী হল। রায়কাঞ্চন খগেন্দ্র রায়ের দলের উপর চললো পাল্টা হানা। রাজরোষ এবার রতনমনি এবং তাঁর দলবলকে গ্রেপ্তার করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করল। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রতনমনিকে গ্রেপ্তার করে আগরতলা নিয়ে আসা হয়। তারপর হত্যা। রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে বিচারের পূর্বেই তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। এ হত্যায় মহারাজার হাত ছিল না। মহারাজার এক ভাই তাঁকে মহারাজার অজান্তেই হত্যা করেছিলেন।

মহারাজের কাছ থেকে ন্যায়বিচার না পেয়েই রতনমনি বিকল্প সরকার গঠন করেন এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এ সত্য অনস্বীকার্য। এ সত্য অস্বীকার করার ক্ষমতা মহারাজের নেই। এ কলঙ্ক, যতোদিন বাঁচবেন তাঁর পেছনে ধাওয়া করবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ। ভারতীয়দের হাতে শাসনব্যবস্থা তুলে দেবার তোড়জোড় চলছে। মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু, জিন্না, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদের সঙ্গে দ ফায় দফায় পরামর্শ করছেন লর্ড মাউন্টব্যাটন। জিন্না ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ চান। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে প্রধানমন্ত্রীত্ব দিয়ে দেশভাগ রুখতে চেয়েছিলেন। বেঁকে বসলেন নেহেরু, প্যাটেল। দেশে আগুন জ্বলছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে দেশজুড়ে।

এমন একটা অস্থির সময়ে দলবলসহ ত্রিপুরায় প্রায় পাঁচ বছর পর ফিরে এলেন কলাবতী। ফিরেই শুনলেন, নক্ষত্রের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। যারা যুদ্ধে গিয়েছিল সবাই ফিরে এসেছে। সবাই ধরে নিয়েছেন নক্ষত্র যুদ্ধে মারা গেছেন। প্রথমে ইলাদেবীর খোঁজ করলেন কলাবতী। শুনলেন ইলা কুচবিহারে আছেন।

দাদা মহারাজের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন কলাবতী। বীরবিক্রম অপরাহ্নে তাঁর শয়নকক্ষে ডেকে পাঠালেন। কলাবতী এসে 'হালাম' বলে মাথা নিচু করে দাঁড়ালেন। বীরবিক্রম সস্নেহে তাঁকে পাশে বসতে বললেন। বীরবিক্রমের মুখ বিষণ্ণ। মনে হল, বীরবিক্রম কাঞ্চনপ্রভার সঙ্গে শলাপরামর্শ করছিলেন।

বীরবিক্রম বললেন, আয়, আয়। শুনলাম, সারা ভারত ঘুরে এসেছিস, এমনকি ইউরোপেও গেছিস।

মাথা নেড়ে হাঁ বললেন কলাবতী।

জানিস, ট্র্যাভেলিং ইজ আ পার্ট অব এডুকেশন। সত্যি বলতে কি বার বার বিদেশ ভ্রমণ করেই আমার চোখ খুলেছে। কি করে ভালোভাবে বাঁচতে হয় এবং তার জন্য রাজার কী কর্তব্য এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছি। অনেক কিছু করার ইচ্ছে ছিল ত্রিপুরার জন্যে। স্বপ্ন স্বপ্ন-ই থেকে গেলো।

কেন দাদা মহারাজ, এখনো সময় আছে।

রাজত্ব থাকলে তো করবো? আমিই ত্রিপুরার শেষ মহারাজ। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তোর বাউজ (বৌদি) মহারানীর সঙ্গে এ নিয়েই কথা বলছিলাম। বলছিলাম, ভারত স্বাধীনতা পাবার আগে আমার যদি কিছু হয় যেন নির্দ্বিধায় ভারতে যোগ দেয়

ত্রিপুরা। এ ব্যাপারে যেন অন্যথা না হয়। তারপর দুঃখের হাসি হেসে বললেন, হিন্দুরাজ্য ত্রিপুরা যদি ভারতে যোগ না দেয়, তাহলে পাকিস্থানে যাবে ত্রিপুরা। আর তার একটিও যদি না হয় তবু রাজার রাজত্ব থাকবে না। বাইরে ছিলি, জানিস না ত্রিপুরা আর আগের ত্রিপুরা নেই। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার সাধ্য আমার নেই। রাজত্ব এমনিতেও যাবে ওমনিতেও যাবে রে।

কাঞ্চনপ্রভা এবার বললেন, সব দেশীয় রাজ্য কী করে আগে দেখ।

কোন দেশীয় রাজ্যই থাকবে না। সবাইকে ভারতে নয় পাকিস্থানে যোগ দিতে হবে।

না দিলে?

ভারতের সার্বভৌম শক্তি আমাদের সার্বভৌমত্ব কেড়ে নেবে।

কলাবতী যেন ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছেন এমনভাবে বললেন, আমাদের চলবে কী করে?

মহারাজ হাসলেন, মরা হাতী লাখ টাকা। প্রিভি পার্শের কথা হচ্ছে।

আমাদের চলবে?

চালাতে হবে রে।

মহারাজা কাঞ্চনপ্রভা আর কলাবতীর হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন তাঁরা এই পরিস্থিতির জন্যে আদৌ প্রস্তুত নন। হা হা করে হেসে পরিবেশকে হাল্কা করতে কথার মোড় ঘোরালেন মহারাজ।

বললেন, যা হবার হবে। দেখা যাবে। অতো চিন্তা করে লাভ নেই। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রঃ। এবার বল, কোথায় কোথায় ঘুরলি? কোন জায়গা তোর ভালো লেগেছে? ভ্রমণকাহিনী লিখেছিস তো?

কলাবতী ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

বিদেশ ঘুরে আমিও 'মেমোরেণ্ডাম অব ট্র্যাভেলস' লিখেছিলাম। পাণ্ডুলিপি হয়েই পড়ে আছে। ছাপাবার সময়ই পেলাম না। রাজত্ব চলে গেলে তো আর কোন কাজ থাকবে না, তখন তোর মতো সারা দিনরাত লিখবো। জানিস, রাজত্ব গেলে একদিকে ভালোই হবে। পিঞ্জরাবদ্ধ জীবরা সব মুক্তি পেয়ে যাবে। বাইরের জীবনে অংশ নিতে তখন আর বাধা থাকবে না। এখন তো প্রাণ খুলে হাসতেও পারি না, তখন হো হো করে হাসবো।

মহারাজের কথায় বেদনা ঝরে পড়ছিল। যার জন্যে আসা তাই ভুলে গিয়েছিলেন

কলাবতী। ভাবছেন, প্রসঙ্গটা তোলা ঠিক হবে কিনা। এক দুই তিন গুণে বলেই ফেললেন কলাবতী।

দাদামহারাজ নিবেদন আছে।

বল, কি নিবেদন?

দাদামহারাজ, একটা মানুষ যে হারিয়ে গেছেন, তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া গেছে কি?

কে সে? মহারাজ বুঝেও না বোঝার ভান করেন।

নক্ষত্র কর্তা- দাদামহারাজ!

বীরবিক্রম বিরক্ত স্বরে বলেন, কোন সুবাদে জিজ্ঞেস করছো?

ভাই বা বন্ধুর খোঁজ বোন বা বন্ধু যেমন নেয়।

ঋজুস্বরে বলেন মহারাজ, একটা কথা ভুলো না কলাবতী, আমি এখনো রাজা, রাজ-কর্তব্য পালনে কোন ত্রুটি রাখি না। নক্ষত্রের খোঁজ খবর আমি নিয়েছি। মৃত্যুসংবাদ পাই নি। কোথায় আছে জানি না তবে আশা রাখি অনতিবিলম্বে ফিরে আসবে।

কলাবতীর চোখ ছল ছল করে ওঠে। মনে মনে বলে, এত বড় যুদ্ধক্ষেত্রে কে মরে পড়ে আছে, সবাইকে কি সনাক্ত করা যায়?

মহারাজ কলাবতীকে সান্ত্বনা দেন, ভাবিস নি বোন, আমার বিশ্বাস নক্ষত্র ফিরে আসবে।

কলাবতী তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর পাণ্ডুলিপি মহারাজের পাশে রেখে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, রেখে গেলাম, সময় পেলে পড়ে দেখো।

মহারাজের কথাই ফললো। হঠাৎ একদিন ইলা এবং দুই পুত্রসন্তান ও কন্যা সহ নক্ষত্র ত্রিপুরায় হাজির। যুদ্ধশেষে মন ভারাক্রান্ত থাকায় নাকি নানা তীর্থ ভ্রমণ করে কুচবিহারে যান। লজ্জার মাথা খেয়ে কলাবতী দেখা করতে লালু কর্তার মহলে গেলেন। নক্ষত্র বেশ রোগা হয়ে গেছেন। মুখে ক্লান্তির ছাপ। কলাবতীর সঙ্গে ইলাদেবীর এই প্রথম সাক্ষাৎ। পরিচয়ের পর হৈ হৈ করে স্বাগত জানালেন ইলাদেবী।

ওমা, আমার কি সৌভাগ্য! তোমাকে দেখবো বলে কতদিন থেকে তড়পাচ্ছি। এতদিন পর শেষ পর্যন্ত দেখা তো হল।

কলাবতী উত্তর দিলেন, আমিও তোমাকে দেখার জন্য ছটফট করছিলাম। কি

করবো বল, রাজ্যের বাইরে যে যেতে হল।

দেখা তো হল।

তা-হল।

তুমি আমার চাইতে অনেক বেশি সুন্দরী।

তাই নাকি?

আমি শুনেছি তুমি গুণবতী মহিলাও বটে।

তাই? এসব খবর কে দিলো তোমাকে?

খবর আবার কে দেবে? খবর ছড়ায়।

গুণের ব্যাখ্যা কর।

তোমার অনেক গুণ সে আমি শুনেছি, তবে তুমি একটা ভীতু কোথাকার!

মানে?

মানে বোঝ না? একটা মেয়েমানুষ কি আরেকটা মেয়েমানুষকে ফাঁকি দিতে পারে?

খুলে বল।

ভালোবাসার লোককে কেউ অন্যের হাতে তুলে দেয় না।

কি বলছো তুমি?

ডোন্ট বি সিলি। তুমি খুব ভালো এটা আমি মানি, তার মানে তো এই নয়, নিজেকে ঠকাবে?

আমি যা করি সুস্থমস্তিষ্কে করি।

তা আমি জানি গুণবতী কলাবতী! তুমি শেকলের বাইরে পা বাড়াতে জানো না।

কিসের শেকল?

তোমার পায়ে। দেখো, শেকলের দাগ তোমার পায়ে লেগে আছে।

ইলা, তুমি আমাকে দিয়ে কী স্বীকার করাতে চাও?

পথে এসো। তুমি তোমার প্রেমিককে আমার হাতে তুলে দিলে কেন?

সে তোমায় ভালোবেসে বিয়ে করেছে ইলা। আমি বাধা হয়ে দাঁড়াবার কে?

ইন্দিরাকেও নক্ষত্র ভালোবেসেছিল কিন্তু আমি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

সে আমি জানি না। কলাবতী তর্ক এড়ায়।

তুমি জানো না কিন্তু আমি জানি। আমি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম কেন জানতে চাও না?

বল, আমি শুনছি।

ইন্দিরা নক্ষত্রের প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু তাঁর মনে দ্বিধার পাহাড় ছিল — তাই।

আমারও দ্বিধা ছিল তাই বার বার ওকে ফিরিয়ে দিয়েছি। ইন্দিরার সঙ্গে আমার পার্থক্য কোথায়?

পার্থক্য? পার্থক্য আছে। ইন্দিরাকে সত্যিই স্ত্রী হিসেবে চায় কিনা তা নিয়ে নক্ষত্রের মনেও দ্বন্দ্ব ছিল। ইন্দিরাও তা চায় কিনা তা নিয়েও তাঁর ধন্ধ ছিল।

তাহলে?

তোমার ক্ষেত্রে তা নয়। বার বার সে তোমাকে চেয়েছে, তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো। তোমাকে নিয়ে তাঁর কোন দ্বিধা নেই, সে তোমাকে প্রাণভরে ভালোবাসে, আর তুমি?

আমি কী?

তুমিও ভালোবাসো, না হলে লজ্জার মাথা খেয়ে আমি আছি জেনেও তাঁকে দেখতে আসতে না।

না না, ঠিক নয়। যুদ্ধের শেষে সবাই ফিরে এসেছে, সে আসেনি, উদ্বেগ হবার কথা নয়?

কী হিসেবে, বোন না প্রেমিকা?

তা তুমি যা ইচ্ছে ভাবতে পারো।

বাস্তবকে স্বীকার করতে অতো ভয় কেন? এই জন্যেই তো বললাম তুমি একটা ভীতু কোথাকার! জানো, আমাকে আদর করতে গিয়ে সে তোমার নাম ধরে ডাকে। ঘুমের মধ্যেও তোমার নাম করে। একি স্বপ্ন না সত্যি?

আমি জানি না। তোমরা সুখে থাকো এই আমার কামনা। আজ চলি।

চলি বললেই কি যাওয়া যায় নাকি? বলে নক্ষত্রের প্রবেশ। সদ্যোস্নাত নক্ষত্র একটা ড্রেসিং গাউন পরে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আজ এখানে খেয়ে যাবে। আমি তো কথা বলারই সুযোগ পেলাম না। কতোদিন বাদে দেখা। কতো কথা জমে আছে। আমার যুদ্ধের গল্প শুনবে না?

না, আমাকে এখন যেতে হবে।

কেন? এখন তোমাকে যেতে হবে কেন? কোন রাজ্যের কাজ পড়ে আছে তোমার রাজবাড়িতে?

আমাকে যেতে হবে। দৃঢ়স্বরে বলেন কলাবতী।

না, তুমি যাবে না। যাবে তো এসেছিলে কেন? এতোদিন বাদে আমাকে দেখতে এসেছিলে, কথা না বলে চলে যাবে এ কি হয়?

আমাকে যেতে দাও কর্তা। আরেকদিন এসে গল্প করা যাবে।

নক্ষত্রের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোয়।

না, আমি তোমাকে যেতে দেবো না। অনেকদিন বাদে আজ বুঝতে পেরেছি তুমি আমাকে ভালোবাসো। নতুবা বিনা নিমন্ত্রণে তুমি আসতে না। তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না কলি!

ইলাদেবী হাততালি দিয়ে বলেন, বাঃ! নাটক জমে উঠেছে। এবার আমার প্রস্থান। কাবাব মে হাড্ডি হতে চাই না।

না, তুমি যাবে না। কলাবতী ইলার হাত ধরে সোফায় বসিয়ে দেন। সারা মুখে অস্বস্তি নিয়ে বলেন, আমাকে নিয়ে তোমাদের ভুল বোঝাবুঝি হোক এটা আমি চাই না। তুমিই বিচার কর। আমি নক্ষত্র কর্তাকে ভালোবাসি কিনা নিজেই জানি না। অনেকবার নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি, উত্তর পাইনি। ওর উদ্দামতা, আমাকে পাবার ইচ্ছে সত্যিই ভালোবাসা না মোহ সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমি যদি আমার মনকে সঠিক বুঝতে পারতাম তবে কবেই অন্য রাজ্যে গিয়ে ঘর বাঁধতাম। সেটা যখন করি নি, তার মানে আমার ভালোবাসায় খাদ আছে, অপর পক্ষের ভালোবাসাতেও আমার সন্দেহ আছে। আমি সুখী হতে চাই, শান্তি পেতে চাই, তাৎক্ষণিক মোহের কবলে পড়ে অমূল্য জীবনকে নষ্ট হতে দিতে চাইনা। আমি কর্তাকে দেখতে এসেছি বলে এটা প্রমাণ হয় না যে আমি তাকে ভালোবাসি। আমি ছাড়াও তো অন্য বোনেরা এসেছে, কই তখন তো এ সব কথা ওঠে না? আমার বেলায় উঠেছে কারণ একসময় আমরা বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। তখন আমি সাবালিকাও ছিলাম না। বয়ঃসন্ধির হঠকারিতাকে এতো মূল্য দিও না ইলা? অতীত ভুলে যাও। বর্তমানে বাস কর। বর্তমানে তোমার সামনে যে কলাবতী দাঁড়িয়ে তার বয়স একত্রিশ, অনেক অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে, পাগলামি আর ভালোবাসা এক নয়। নক্ষত্র পাগলামি করছে, সামলাবার দায়িত্ব স্ত্রী হিসেবে তোমার। না পারলে সে তোমার দোষ। আমাকে দোষ দিও না। বোঝাপড়াটা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হলেই ভালো হয়। আমাকে এর মধ্যে জড়িও না। সুখে থাকো।

কলাবতী হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

নক্ষত্র ও ইলা স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন।

১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর সদর বিভাগের দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় মাত্র ১৯

জন শিক্ষিত যুবকের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জন্ম হয় ত্রিপুরা রাজ্য জনশিক্ষা সমিতি। এই সমিতির সভাপতি হন অবসরপ্রাপ্ত জজ হৃদয়রঞ্জন দেববর্মা এবং সহ-সভাপতি শিল্পী ঠাকুর ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা। ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। নবনিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রী ব্রাউন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় তিন শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মঞ্জুরী দেওয়া হয়। ব্রাউন সাহেব ছিলেন জাতিতে ইংরেজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষদিকে সামরিক বাহিনীর অফিসার হিসেবে কিছু সময়ের জন্যে তাঁর কর্মস্থল ছিল আগরতলা। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর মহারাজা বীরবিক্রম তাঁকে তাঁর সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে জনশিক্ষা সমিতির সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

দশরথ দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা, নীলমনি দেববর্মা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্যে সরকারী অনুমোদন প্রার্থনা করে মহারাজা বীরবিক্রমের সঙ্গে দেখা করেন। দেখা হবার পর নীলমনি দেববর্মা সবাইকে বলেন, ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে মহারাজা উদারমনা হয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, ত্রিপুরার প্রতি ঘরে শিক্ষা বিস্তারের স্বপ্ন-ই তো দেখি আমি। সর্দারদের কতোবার বলেছি, সমতলে নেমে এসো, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আলো দাও। অন্ধ হয়ে থেকো না। ভালো মন্দ বুঝতে শেখো, না হয় ঠকতে হবে। মনুষ্যজাতি ক্রমাগত সামনে এগিয়ে চলেছে। এখনো সময় আছে না হলে পিছিয়ে পড়তে হবে। জানেন, যখনই আমরা স্কুলের লিষ্ট নিয়ে রাজদরাবরে গেছি তখনই তিনি উদারহস্তে সেগুলির মঞ্জুরী দিয়েছেন। ভাবুন, মহারাজের যদি জন শিক্ষা সমিতির উপর সহানুভূতি না থাকতো তাহলে তিনশ পঞ্চাশটিরও বেশী স্কুলের মঞ্জুরী আদায় করতে পারতাম? রাজার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তা কী সম্ভব? রাজার বিরুদ্ধে কথা বলার লোক তো কম নয়? একজন, নাম বলবো না, বলেছেন, ব্রাউন সাহেবের জন্যেই নাকি এটা সম্ভব হয়েছে। মঞ্জুরী কি ব্রাউন সাহেব দেবেন? রাজতন্ত্রে মহারাজের কথাই তো শেষ কথা।

বীরবিক্রম শুনেছেন, দশরথ দেববর্মা তাঁদের সাক্ষাতের ব্যাপারে নাকি বলেছেন, জনশিক্ষা সমিতির মোকাবেলা করার জন্যে পাহাড়ী সর্দারদের নিয়ে তিনি পাল্টা সংগঠন গড়তে চেয়েছিলেন। সর্দারদের প্রভাব খাটিয়ে জনশিক্ষা সমিতির টুঁটি টিপে মারা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। উঠতি পাহাড়ী যুবকনেতা বলে দশরথকে মহারাজা মনে মনে স্নেহ করেন। পাহাড়ী ছেলেরা শিক্ষিত না হলে ত্রিপুরা ত্রিপুরাতেই পড়ে থাকবে। ছেলেটা আবার নাকি কম্যুনিষ্টভাবাপন্ন। সে তো ভালোই, শোষণের রাজত্ব শেষ

হলে দেশের মঙ্গল। একটা পাহাড়ী যুবক যদি দশটা পাহাড়ী যুবককে আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন করতে পারে তো তাঁর স্বপ্ন সার্থক হবে।

দাঙ্গা, দাঙ্গা, ১৯৪৬ সাল।

ভারতের সব প্রদেশে দাঙ্গা শুরু হয়ে গিয়েছে। যুক্ত বাংলার লীগ মন্ত্রীসভা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়, তার আগুন ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার গ্রামাঞ্চলে। নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জে সংগঠিত দাঙ্গায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু লোক নিহত হয়। বহু নারীর ইজ্জত যায়। বহু বাড়িঘর ভস্মীভূত হয়। আর্ত মানুষের চিৎকারে আকাশ বিদীর্ণ। গ্রামের পর গ্রাম ছেড়ে চলে গেল আতঙ্কিত মানুষ। বিরাট অঞ্চলে নেমে এল শ্মশানের স্তব্ধতা। মহাত্মা গান্ধী ছুটে এলেন দাঙ্গা কবলিত রামগঞ্জে। মানুষের মনে শুভবুদ্ধি জাগ্রত করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে শান্তির পদযাত্রায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালেন মহাত্মাজী। শুরু হল সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের হিড়িক। প্রায় সব দিক থেকে বইতে লাগলো দেশছাড়া, ঘরছাড়া উদ্বাস্তুদের স্রোত। ত্রিপুরার বন-জঙ্গলে ভরা টিলাভূমিই দেশত্যাগী আতঙ্কিত মানুষের পরম নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হল।

মহারাজ বীরবিক্রম বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের স্বাগত জানাতে ত্রিপুরার সীমানার দ্বার খুলে দিলেন। শত সহস্র উদ্বাস্তুদের জন্যে বাসস্থান ও লঙ্গরখানা খোলা হল। সাম্প্রদায়িক প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে সদরে উপযুক্ত হিন্দু ও মুসলমান সদস্য নিয়ে ১৯৪১ সালে যে কেন্দ্রীয় প্রীতি বিধায়ক সমিতি গঠিত হয়েছিল তাদের উপর ন্যস্ত হয় উদ্বাস্তুদের দেখাশোনার ভার। বীরবিক্রম গান্ধীজীকে ত্রিপুরায় আসতে আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুরোধ করেন, যেন তিনি এসে আশ্রয়প্রার্থীদের আশীর্বাদ করে যান। কিছুদিন পর রাজমন্ত্রীকে মহারাজ গান্ধীজীর নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু নোয়াখালি, বিহার ও কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণকল্পে সেসব স্থানে অবস্থান করায় শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর ত্রিপুরায় আসা হয় নি। নোয়াখালির শ্রীরামপুর হতে বাংলা ভাষায় গান্ধীজী চিঠি লিখলেন—

শ্রীরামপুর, নোয়াখালি
১৪/১২/১৯৪৬ ইং

মহারাজা সাহেব,

আপনার ৯ তারিখের অনুগ্রহ লিপি দেওয়ান বাহাদুর বিজয় কুমার সেন মহাশয়ের

হাতে গতকাল পৌঁছিয়াছে তৎজন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। পত্রে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, দেওয়ান বাহাদুরের সঙ্গে তাহা আমি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। তিনি আমার বক্তব্য আপনার নিকট স্বয়ং জানাইবেন। সেই জন্য পত্রে আর ইহা উল্লেখ করিলাম না।

শুনিলাম আপনি জানুয়ারী মাসে কলিকাতা হইতে ফিরিবেন। সেই সময়ে আমার পক্ষে যদি অবসর পাওয়া যায়, তবে সাক্ষাৎ হইলে বিশেষ সুখী হইব।

ইতি, ভবদীয়

স্বাঃ মোঃ কঃ গান্ধী।

গান্ধীজী ত্রিপুরায় আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন - ম্যায় তো জরুর যাউঙ্গা। কিন্তু ত্রিপুরায় তাঁর আসা হয়ে ওঠে নি।

দেশ জুড়ে এক অরাজক অবস্থা। যুদ্ধের পর ভারতে স্বাধীনতার দাবিতে জনগণ তীব্র আন্দোলনে সামিল হয়। বৃটিশ সরকার কৌশলে আন্দোলনকে দুর্বল এবং বৃটিশ স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। বৃটিশের মদত পেয়ে মুসলমানরা দারুণ উৎসাহে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে পাকিস্থানের দাবিতে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

বৃটিশ সরকার যাই করুক না কেন, বীরবিক্রমের প্রথম কাজ উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলোর সুব্যবস্থা করা। উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলোতে প্রসূতিদের জন্যে কোনরূপ সুবিধা ছিল না। সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নাম দিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাময়িক একটি প্রসূতি সদন করা হয়। সেই প্রসূতি সদনে সেবামূলক কাজের সহায়তায় ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মীরাও এসে যোগ দেয়। প্রসূতি সদনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় মাতৃসেবা সদন। সদনটি পরিচালনার জন্যে একটি কমিটি করা হয়। কমিটিতে ডঃ হেমেন্দ্র দত্ত (মেজর দত্ত) সভাপতি, দ্বিজেন দে সম্পাদক হন। সদস্য হিসেবে কাজ করেন বীরেন দাশগুপ্ত, মলিনা চক্রবর্তী, কর্ণ কিশোর কর্তা ও গোপাল ধানুক। ত্রিপুরা সরকার মাতৃ সেবাসদনকে ৫৮০০ টাকা অনুদান দেয়।

ত্রিপুরা রাজ্যের আবহাওয়া যখন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে উত্তপ্ত হতে থাকে, ঠিক তখনই পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত নিঃস্ব উদ্বাস্তুর দল ত্রিপুরা

রাজ্যে প্রবেশ করতে থাকে। ক্রমে ক্রমে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে। দেশবিভাগও অনিবার্যরূপে দেখা দেয়। বীরবিক্রমের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ত্রিপুরীদের উপর বিশেষ ছাপ ফেলেছিল, তারই প্রভাবে হিন্দু ত্রিপুরীরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে। তাদের মধ্যে কোন উত্তেজনা দেখা যায় না। বীরবিক্রম তাদের বলেন, হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম, মানবধর্ম, সর্বধর্মে বিশ্বাসী। সাম্প্রদায়িক মনোভাব হিন্দুদের শোভা পায় না। পরধর্মকে আঘাত বর্বররা করে, ধার্মিক ব্যক্তি করেন না, কারণ তাঁর কাছে ঈশ্বর, আল্লা এক।

রাজবাড়িতে খবর এলো, ইলা দেবী আর নেই। ঘুমের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খবরটা জেনে রাজবাড়িতে হুলস্থুল পড়ে যায়। রান্না-বান্না যা হয়েছিল সব চাকর-চাকরানীদের মধ্যে বিলি করে দেয়া হয়। অশৌচ পালন হবে। নিরামিষ, ফলমূল খেতে হবে জ্ঞাতিদের। এটাই নিয়ম। শ্রাদ্ধ পর্যন্ত এ নিয়ম চলবে। মহারাজ বীরবিক্রম খবরটা শুনেই লালু কর্তার মহলে চলে গেছেন। পুরুষ, মহিলারা সাদা কাপড় পরে সাদা ফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়ে এখনো যাচ্ছেন। কলাবতী জীবনকুমারী দেবীর কোলে মুখ গুঁজে নীরবে ফুলে ফুলে কাঁদছেন। জীবনকুমারী দেবী কলাবতীর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, ওঠ মা! আমাদের যেতে হবে।

কলাবতী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি যাবো না মা, আমাকে যেতে বোলো না।

সে কি হয় মা? লোকে কি বলবে? শিষ্টাচার রক্ষা করতে হয়।

চল তা হলে।

দুজনে উঠে পড়েন।

লালু কর্তার মহল রাজবাড়ির সীমানার মধ্যেই। এসে যা শুনলেন, হতবাক হয়ে গেলেন কলাবতী। নক্ষত্র এবং ইলাবতীর কাল রাতে তুমুল ঝগড়া হয়। কাকে নিয়ে ঝগড়া হয়েছে কলাবতী অনুমান করতে পারেন। ঝগড়ার পর অনেক মদ গিলে বেহেড হয়ে ইলাবতীকে ধাক্কা মেরে নক্ষত্র কোন এক সেবাদাসীর ঘরে রাত কাটাতে চলে যান। ইলা অনেকগুলো স্লিপিং পিল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সে ঘুম আর ভাঙ্গে নি। কলাবতী ভাবেন, ইলা কি আত্মহত্যার ইচ্ছেয় ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন? না, না, ইলা হয়তো বুঝতেই পারেন নি অতগুলো ঘুমের ওষুধ খেলে ঘুম আর ভাঙ্গবে না।

ইলার মুখ দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন কলাবতী। কি সুন্দর করেই না সাজানো হয়েছে ইলাকে। মনে হয়, রূপবতী রাজরানী ঘুমিয়ে আছেন। কষ্টের কোন চিহ্ন নেই। মুখে চিরশান্তি বিরাজ করছে। যেন কতোদিন বাদে শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন। পুরোহিতরা মন্ত্র পড়ছেন, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি। গীতা পাঠ হচ্ছে। বাচ্চা দুই পুত্র এবং কন্যা মা-র দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। তারা এখনো বুঝতে পারছে না, তাদের মা আর

নেই। এ দেহ ভস্মীভূত হবে। মা আর তাদের আদর করবে না, কাছে ডাকবে না। এক কোণে অপরাধীর মতো নক্ষত্র দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন না। সমবেদনাও জানাচ্ছেন না। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই নির্বাক হয়ে গেছেন। কলাবতীর চোখ পড়ে নক্ষত্রের দিকে। নক্ষত্র তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছেন নতমুখে, অসীম যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে গেছে।

মহারাজ বীরবিক্রম লালু কর্তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কাঞ্চনপ্রভা কাকে ডেকে দুই ছেলের জন্যে কাছা দিয়ে বললেন, হাওড়া নদীতে চান করার পর পরতে দেবে। মুখাগ্নির পরই ওদের বাড়ি নিয়ে আসবে। বেচারীরা সকাল থেকে কিছু খায় নি।

কলাবতীর হঠাৎ মনে পড়লো কিছুদিন আগে অনেক খেটে কারুকার্য করা একটা পদ্মঝালর মশারী তিনি বানিয়েছেন। এটাই তবে হোক ইলাদেবীকে তাঁর শেষ উপহার। ঝিকে ডাকলেন কলাবতী। তাকে আদেশ করলেন, রাজবাড়ি থেকে তাঁর ওই পদ্মঝালর মশারী যেন সে নিয়ে আসে। রাজবাড়ির নিয়মানুসারে মৃতের পালঙ্কে মশারী টাঙ্গিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

আগরতলায় দুটো শ্মশানঘাট। একটি রাজপরিবারের অপরটি অন্যদের জন্য। মৃতের নামে ওখানে সৌধ বানানো হয়। খই, পয়সা ছিটিয়ে হরিনাম করতে করতে মৃতের পালঙ্কে মশারী খাটিয়ে কাঁধে করে খালি পায়ে শ্মশানঘাটে নিয়ে যেতে হয়। শ্মশানের আগুন নিভে গেলে পরদিন অস্থি-বিসর্জন।

সবার কথা কানে আসছে কলাবতীর। সবাই ইলা দেবীর নানা গুণের কথা আলোচনা করছেন। কেউ তাঁর দ্রুতবেগে ঘোড়া চালাবার, কেউ বা গাড়ী চালাবার, আবার কেউ তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাবের প্রশংসা করছেন। এই মনুষ্যসমাজে জীবিতকালে যা দোষ তাই মৃত্যুর পর গুণ হয়ে দাঁড়ায়। ইলা এদের কথাবার্তা শুনতে পেলে খুশি হতেন।

পুরোহিতের মন্ত্র পাঠ শেষ। মহারাজ অনুমতি দিলেন। এবার শ্মশানযাত্রা। হরিবোল ধ্বনি উঠলো। অনেকে মিলে পালঙ্ক কাঁধে তুলে নিলো। সামনের দিকে নক্ষত্রও তাঁর কাঁধ দিলেন। বাড়ির বাইরে বিরাট জনতা শোকযাত্রায় সামিল হতে অপেক্ষা করছে। দুই ছেলে সামনে সামনে চললো। পেছনে রাজপরিবার ও লোকলস্কর। হরিবোল ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস শোকে কেঁপে কেঁপে উঠলো যেন।

লালু কর্তার মহল থেকে মহারাজ বীরবিক্রম অন্দরমহলে এসে পোষাক পরিবর্তন করেই সরাসরি চলে এলেন রাজদরবারে। মন্ত্রী বিজয় কুমার সেন, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাউন

সাহেব সহ অন্য গণ্যমান্য পরিষদরা উপস্থিত আছেন। শোকদিবসের জন্যে লালু কর্তাকে আসতে বারণ করা হয়েছে। বিষয় - ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতি।

ত্রিপুরায় জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হবার পর ত্রিপুরী সমাজে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে উন্নত সমাজ গঠনের তীব্র আকাঙক্ষা প্রকাশ পায়। সারা রাজ্যের ত্রিপুরীদের উন্নয়নের স্বার্থে জনশিক্ষা আন্দোলনে কংগ্রেস নেতারা সহযোগিতার পরিবর্তে জনশিক্ষা সমিতিকে একটি কম্যুনিষ্ট সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে এর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরীদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করা। উদ্বাস্তু আগমনকে স্বাগত জানাবার হিড়িক দেখে এই সত্যই উপলব্ধ হয়। ভারত স্বাধীন হলে ত্রিপুরা ভারতের অঙ্গরাজ্য হবে। ত্রিপুরীরা কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছে অতএব সংখ্যাধিক্য বাঙ্গালীর ভোটেই সরকার গড়তে পারবে কংগ্রেস, অন্যথায় নয়। গণতন্ত্রে সংখ্যা প্রধান।

জনমঙ্গল সমিতি, জনশিক্ষা সমিতি এবং আরো কিছু কম্যুনিষ্টভাবাপন্ন ব্যক্তিরা ১৯৪৬ সালে ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামণ্ডল নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় আগরতলার কৃষ্ণনগরে স্থাপিত হয়। যোগেশচন্দ্র দেববর্মা এই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট এবং বীরচন্দ্র দেববর্মা সেক্রেটারি হন। জনগণের নির্বাচনের দ্বারা দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য তাঁরা যে আন্দোলন করেন তা গ্রামাঞ্চলের অভ্যন্তরেও প্রসার লাভ করে। রাজন্যশাসিত ত্রিপুরা নয়, গণতান্ত্রিক ত্রিপুরার পক্ষে সব দল একজোট হয়। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই আজকের দরবার সভা।

প্রথমে বক্তব্য রাখেন ব্রাউন সাহেব। উত্তেজিতভাবে তিনি বলেন, হু ইজ নেহেরু? হাউ ডেয়ার হি ইন্টারফেয়ার্স্ ইন দ্যা ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স অব ত্রিপুরা?

সবাই বললেন, নেহেরুর চিঠির তো উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে, অতএব এ প্রসঙ্গ তুলে লাভ নেই। বর্তমান পরিস্থিতিব মোকাবিলা কিভাবে করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হোক।

নেহেরুর চিঠির জবাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর রাজনৈতিক বন্দীদের অনেককেই মুক্তি দেওয়া হলে আবার নতুন উদ্যমে আন্দোলন শুরু হয়। বিভিন্ন সমিতিও এই সময় সৃষ্টি হতে লাগলো। এই আন্দোলনকে কিভাবে প্রশমিত করা যায় তার জন্যেই এই দরবার।

মহারাজ বললেন, দেয়ালের লিখন আমি পড়তে পারছি। ভারত স্বাধীন হল বলে। দমননীতি চালিয়ে আর কী লাভ? শুধু শুধু মহারাজের নাম খারাপ হবে।

ব্রাউন সাহেব এবং বিজয় কুমার সেন একযোগে বললেন, অরাজকতা হলে শান্তি বিঘ্নিত হয়। শান্তিস্থাপন রাজকর্তব্য। কিছু লোক রাজনৈতিক ফায়দা তুলছে। দেশের আপামর জনসাধারণ এখনো রাজাকে ঈশ্বরস্বরূপ দেখে, শ্রদ্ধাভক্তি করে। তাদের মুখ চেয়ে মহারাজ তাঁর কর্তব্য স্থির করুন। শান্তিস্থাপনে প্রয়াসী হোন।

সভায় শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল একটি ঘোষণা জনসাধারণ্যে প্রকাশ করা হবে —

'যেহেতু বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষার্থে কোনরূপ অবাঞ্ছনীয় রাজনৈতিক উত্তেজনা বা বিক্ষোভ সৃষ্টি নিবারণ করা আবশ্যক, অতএব, ত্রিপুরা শাসনতন্ত্রের ৪৪ (ক) ধারা এবং রাজ্যেশ্বর স্বরূপে এ-পক্ষের স্বাধিকারবলে এতদ্বারা আদেশ করা যায় যে অতঃপর এ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারীর সাধারণ বা শর্তাধীন লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ রাজ্যে রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট অনুমতির অভাব স্থলে বা অনুমতির শর্তের বা নিষেধ-বিধির ব্যতিক্রমে সভা বা শোভাযাত্রা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে এবং যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ কার্যকারক উক্ত প্রকার বেআইনী সভাসমিতি বা শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। বে-আইনী সভাসমিতি বা শোভাযাত্রার উদ্যোক্তা, অনুষ্ঠাতা বা যোগদানকারীগণ বিচারে সশ্রম বা বিনাশ্রমে অনধিক তিন বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়প্রকার দণ্ডাদিষ্ট হইবে। এরূপ অপরাধ পুলিশ ধর্তব্য ও জামিন যোগ্য হইবে।'

স্বাধীন ভারতবর্ষের পতাকা উড্ডীন হতে মাত্র সময়ের অপেক্ষা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশীয় রাজাদের কাছ থেকে বৃটিশ সরকার আশাতীত অর্থ ও সৈন্য সাহায্য পেয়েছিল। ফলে কর্তৃপক্ষের ধারণা হয়েছিল, দেশীয় রাজ্যগুলির সমবায়ে একটি ফেডারেল ষ্টেট তৈরী করে ভারতের স্বাধীনতার পরেও বৃটিশ স্বার্থরক্ষার একটু ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যাবে। এই উদ্দেশ্যে দেশীয় রাজাদের সংগঠন — 'চেম্বার অব প্রিন্সেসকে' সক্রিয় ও মজবুত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ত্রিপুরার মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সভাপতি নির্বাচিত হন।

মহারাজা বীরবিক্রম পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, মণিপুর ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলের সর্দারদের সঙ্গে কয়েকবার আলোচনা করেও ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টায় সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। ফলে দারুণ হতাশায় মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। কারণ, দেশের পরিস্থিতি দ্রুত জটিল রূপ নিচ্ছে। বিশ্বযুদ্ধক্লান্ত ও দুর্বল বৃটিশ সাম্রাজ্য পরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্যে তৈরী হচ্ছে। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ভারতকে স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বৃটিশ সরকার। কিন্তু নৌ-

বিদ্রোহের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে এক বছর আগেই স্বাধীনতা দেবার ঘোষণা করে। দেশীয় রাজাদের আশা নির্বাপিত হয়।

মহারাজকে আজ বড় একা নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। ত্রিপুরার তিনিই প্রথম মহারাজ যিনি সংখ্যাগুরু উপজাতি প্রজাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। তাঁর আগে আর কোন মহারাজা ত্রিপুরীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আন্তরিক চেষ্টা করেন নি। জনশিক্ষা সমিতি কম্যুনিষ্টভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনশতাধিক বিদ্যালয়কে তিনি মঞ্জুরী দান করেন। সরলপ্রাণ ত্রিপুরীরা সাধারণ জীবনযাপনেই অভ্যস্ত। জুমচাষ করে পেট ভরে ভাত খেয়েই খুশি। শিক্ষার আলোর মূল্য তাদের কেউ বোঝায় নি, তারা বুঝতেও চায়নি। চাকলা রোশনাবাদের জমিদারী চলে গেলে ত্রিপুরার আয় নামমাত্র। এ সত্যও কোন মহারাজা হৃদয়ঙ্গম করেন নি, রাজ্য যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত না হয় তাহলে শিক্ষাবিস্তারও বাধাপ্রাপ্ত হয়। জুমিয়া প্রজাদের সমতল-চাষে আগ্রহী করার জন্য নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু সরলপ্রাণ ত্রিপুরীরা তাঁর নির্দেশ ও উপদেশের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে নি। কোন রাজনৈতিক সংগঠনও নেই যাতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলা যায়।

ত্রিপুরার এখন উভয় সংকট। ভারতে যোগ দিলে পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় বিধ্বস্ত নিঃসহায় লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর ভীড় ত্রিপুরার দিকেই ছুটে আসবে আশ্রয়ের আশায়। কারণ, ত্রিপুরায় বাঙ্গালী সংস্কৃতি। রাজভাষা—বাংলা। কংগ্রেস যদি ত্রিপুরাকে পাকিস্থানে ঠেলে দেয় তাহলে ত্রিপুরায় মুসলিম বসতি হবে। অনেক চিন্তা করে মহারাজা এ রাজ্যের উপজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে মেমো নং ৪৯-১৯৩৯ এবং আদেশ নং ৩২৫-১৯৪৩ অনুসারে ত্রিপুরার মোট আয়তন ৪১১৬ বর্গমাইলের মধ্যে ২১৭০ বর্গমাইল জমি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ঘোষণা করেছেন। এখন তাঁর মাথায় সমস্ত উপজাতিদের পুনর্বাসনের চিন্তা ঘুরছে। ভারতে যোগ দেবার আগে এ কাজটা করতেই হবে।

মাত্র কয়েকদিন আগে বীরবিক্রম মাণিক্য আগরতলায় ত্রিপুরী জাতীয় সম্মিলনীর এক সভার আয়োজন করেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা। ত্রিপুরার নিজস্ব সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধার করা। ত্রিপুরীদের অস্তিত্বরক্ষার কবচ খুঁজে পেতে মহারাজ কৃতসংকল্প ছিলেন। এই সভায় ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং, হালাম, নোয়াতিয়া প্রভৃতি উপজাতির প্রায় দশহাজার লোক উপস্থিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকুমার দেববর্মা। ললিতমোহন দেববর্মা, এবং

জীতেন্দ্রমোহন দেববর্মা তাঁদের বক্তব্য রাখেন এবং ত্রিপুরার উপজাতিদের বিভিন্ন সুযোগসুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে মহারাজের কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। এই সভার আবেদনগুলি মহারাজ কার্যকরী করবেন বলে স্থির করেছেন। এ সম্মিলনীর সভাতেই ত্রিপুরসংঘ নামে একটি সংঘ এপ্রিল ১৯৪৭ সালে গঠিত হয়।

মহারাজের হঠাৎ মনে পড়লো মহারানী কাঞ্চনপ্রভাকে সবিস্তারে তাঁর ভবিষ্যৎ ধ্যান-ধারণার কথা বলে যেতে হবে। পুত্র কিরীট নাবালক। ত্রিপুরার মহারাজারা কেউ বেশি বয়স অবধি বাঁচেন না। মহারাজ বললেন, মহারানীকে সেলাম দাও।

মহারাজের শয়নঘরের জানালায় বসে একটা কাক কা-কা করে তীব্রস্বরে চিৎকার করছিল। নিজের ঘর থেকে দেখতে পেয়ে কলাবতী বার দুই হুস হুস শব্দ করে কাককে তাড়াবার চেষ্টা করলেন। তাঁর গলার আওয়াজ পেয়ে নাকি কে জানে কাকটা আরো জোরে চেঁচাতে লাগলো। কাকের ডাক আশু অমঙ্গলের চিহ্ন। কলাবতীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কলাবতী মনে মনে দুর্গা নাম জপ করলেন। হঠাৎ ধুপ করে কাকটা মাটিতে পড়ে গেলো। দেখলেন, বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে কিরীট হাততালি দিচ্ছে। গুলতির অব্যর্থ লক্ষ্যে কাকটাকে মেরে ফেলেছে সে। সারা রাজবাড়ি জুড়ে এখন কাকের ভিড়। অসংখ্য কাকের কা কা রবে কান ঝালাপালা। ঘর থেকে বেরোবার উপায় নেই। ঠোকর মারতে সোঁ করে এগিয়ে আসছে একদঙ্গল কাক। অবস্থা দেখে বকুনির ভয়ে কিরীটবিক্রম পালিয়ে গেলো। তাকে এখন কিছু সময়ের জন্য পাওয়া যাবে না। প্রহরীরাও মাথা বাঁচাতে ঘরের ভেতরে ঢুকে বসে আছে।

মহারাজের গলা শোনা গেলো।

কে মেরেছে কাকটাকে?

কে মেরেছে কেউ দেখেনি, একমাত্র কলাবতী ছাড়া। বাড়িতে তিষ্ঠোনো দায়। কাকদের দাপাদাপিতে অন্দরমহলে কেউ ঢুকতে পারছে না, বেরোতেও পারছে না। আশপাশ থেকে অসংখ্য কাক ছুটে এসে ভিড়ে সামিল হচ্ছে। কি বীভৎস কর্কশ স্বর। কিছু একটা করতেই হবে। বন্দুকধারীদের ডাকা হল। আকাশে দু-তিনবার ফায়ার করতে ভিড় একটু হাল্কা হল। দেওয়ালির কিছু পটকা বেঁচে গিয়েছিলো। সবাই মিলে কাকটা যেখানে মরে পড়ে আছে সেদিকে পটকা ফাটাতে লাগলেন। দুম দুম আওয়াজে মনে হল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এবার কাকেরা মরা কাককে ছেড়ে পালালো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সবাই। একজন রক্ষী কাকটাকে তুলে নিয়ে বাইরে কোথাও ফেলে দিয়ে এল। রাজবাড়ির পরিখার বাইরে মানুষের ভিড়। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করছে, কি হয়েছে? কাক-শিকারীকে ধরা গেল না। কাকটাকে কে মেরেছে কেউ জানে না।

মহারাজা ভাবলেন, কাকদের কি সন্ন্যাসরোগ হয়? কে জানে হয়তো বা।

সেদিন রাত্রিবেলা মহারাজার কেঁপে জ্বর এল। ডঃ চক্রবর্তী দেখে বললেন, এমন কিছু নয়, সেরে যাবে। বুকে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি বসে গেছে।

জ্বর কিন্তু ছাড়লো না।

পরদিন মহারাজ লালু কর্তাকে ডেকে পাঠালেন। তারিখ ছিল ১৪ই মে ১৯৪৭। সন্ধের সময় লালু কর্তা এলেন। মহারাজ বললেন, কাকাকর্তা, রাজপরিবারের কিছু ব্যক্তি এবং বাইরের কিছু লোক ত্রিপুরার পাকিস্থানভুক্তি নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। আর দেরি নয়। আমার প্রতিনিধি হিসেবে আপনি কালই দিল্লী চলে যান। পণ্ডিত নেহেরু এবং প্যাটেলকে আমার সিদ্ধান্ত জানান যে ত্রিপুরেশ্বরের একান্ত ইচ্ছে ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতভুক্তির প্রস্তাবে ত্রিপুরার প্রতিনিধি হিসেবে আপনাকে চুক্তিতে সহি করার আদেশ দেওয়া হল। পাওয়ার অব এটর্নি আমি সই করে দিচ্ছি। কাল অবশ্যই আপনি রওয়ানা হবেন।

লালু কর্তা একটু আপত্তি করে বললেন, মহারাজের অসুখ সেরে গেলে যেতে দিতে অনুমতি হোক।

না না কাকাকর্তা। ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি খেলা করতে পারি না। আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। আপনি তো সবই জানেন, ত্রিপুরার মহারাজদের আয়ু খুব কম। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তিন পুরুষ চলে গেলেন। আমারও যাবার সময় হয়েছে কিনা কে জানে। কাকা কর্তা, আমার অনুরোধ রাখুন।

বীরবিক্রমের গলায় মিনতি।

লালু কর্তা, ঠিক আছে - বলে সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন। তাঁর এখন অনেক কাজ বাকি। কাগজপত্র সব ঠিকঠাক করতে হবে। কারা তাঁর সঙ্গে যাবেন সে সিদ্ধান্তের ভারও মহারাজ তাঁকে দিয়েছেন।

লালু কর্তা চলে যেতে মহারাজ তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই দুর্জয়কিশোরকে ডেকে পাঠান।

দুর্জয় এসে, হালাম বলতেই মহারাজ রাগে ফেটে পড়েন।

সেদিনের রাজার হাতীর মাহুত গেঁদু মিঞার সঙ্গে রাজকুমার হয়ে তুমি ষড়যন্ত্র করছো?

দুর্জয়কিশোর ভালমানুষের মতো বলেন, মহারাজের বক্তব্যের সারমর্ম অধমের বোধগম্য হচ্ছে না।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে বীরবিক্রম বললেন, ও তাই নাকি? তুমি কিছুই জানো না, না? তাহলে খোলসা করে বলি। গেঁদু মিঞার আঞ্জুমান ইসলামিয়া মুসলিম লীগেরই অন্য নাম। হাতীর মাহুত এখন নেতা আর এক রাজকুমার তার ডান হাত। পাকিস্থানে

ত্রিপুরা যোগ দিলে তোমাকে ত্রিপুরার রাজা করবে বলে কথা দিয়েছে, তাই না? আর ওই দেওয়ান সত্যব্রত মুখার্জী তোমার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিয়ে রাজার শ্বশুর হবেন। ভালো প্ল্যান করেছো। তোমাদের মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডকে আমি তোয়াক্কা করি না। আমার প্রজারাই সশস্ত্র বাহিনী গড়ে প্রতিরোধ করবে।

মহারাজের কথা শুনে দুর্জয়কিশোরের মুখ মেঘলা আকাশের মতো দেখালো। আমতা আমতা করে বললেন, মহারাজ কি অপমান করতে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

অপমান? দাঁত কিড়মিড় করে বললেন বীরবিক্রম, তোমার আবার অপমান বোধ আছে নাকি? একটা হাতীর মাহুত তোমাকে রাজা করে দেবে, ভাবলে কী করে? তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে।

দুর্জয়কিশোর অপমান সহ্য করে বললেন, আমি এমন কিছু কাজ করি নি যাতে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়।

তুমি ত্রিপুরার পাকিস্থান অন্তর্ভুক্তি চাও কি চাও না?

চাই এমন কিছু প্রমাণ আছে?

প্রমাণ না থাকলে তোমাকে ডেকে পাঠাতাম না।

কি প্রমাণ?

তোমাদের গোপন সভার লিপিবদ্ধ বিবরণ আমার কাছে আছে।

তাতে কিছু প্রমাণিত হয় না।

অর্থাৎ?

যে কেউ আমার নামে সভার বিবরণে যা ইচ্ছে লিখতে পারে।

কিন্তু তোমার সইটা? তাও কি অন্য কেউ করে দিয়েছে?

ওটা নকল। আমি সই করি নি।

এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না বীরবিক্রম, রাগে গর গর করতে করতে জ্বরে-কাবু শরীর নিয়ে উঠে বসতে চান। নার্স দৌঁড়ে আসে। নার্সের সামনে এসব কথা বলা সঙ্গত নয়।

বীরবিক্রম এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, তুমি যেতে পারো, তবে যাবার আগে একটি কথা জেনে যাও, আমি বেঁচে থাকতে ত্রিপুরা কোনদিন পাকিস্থানে যোগ দেবে না।

মাথা হেঁট করে দুর্জয়কিশোর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চারদিকে এতো শত্রুর মোকাবিলায় ক্লান্ত মহারাজ। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব ত্রিপুরার ভারতে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাচ্ছে না। কংগ্রেস নেতাদের একাংশ

ত্রিপুরার মতো একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের দায়ভার নেওয়া সম্পর্কে আপত্তি তোলেন। বিশেষত ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন রাজ্যের সীমান্ত এবং শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে সংকটের কথা উল্লেখ করা হয়। এ ব্যাপারে বীরবিক্রম অনেক চিন্তা করেছেন। ভারত ভাগ হয়ে গেলে ত্রিপুরা ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। উদ্বিগ্ন মহারাজা বীরবিক্রম ত্রিপুরার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ রক্ষার জন্য সিলেট জেলার ভারতভুক্তি নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়ে আসামের কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বরদলৈকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। মহারাজার এক প্রতিনিধি চিঠি নিয়ে আসামে গিয়েছিল। সিলেট জেলায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। এ বিষয়ে প্রচারআন্দোলন চালাবার জন্যে মহারাজা তিন লক্ষ টাকা বরদলৈকে দিয়েছিলেন। কিন্তু আসামের কংগ্রেস নেতাদের বাঙ্গালী-ভীতি থাকায় সিলেটকে ভারতভুক্তির প্রশ্নে আন্তরিক উদ্যোগ নিচ্ছেন না। মুসলীম লীগ নেতারা তপশীল জাতির নেতাদের মন্ত্রীত্বের লোভ দেখিয়ে পক্ষে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছে।

মহারাজা চাকলা রোশনাবাদ (ত্রিপুরা মহারাজের জমিদারী। দলিল-দস্তাবেজ অনুযায়ী এই জমিদারী ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ বলে ইংরেজ সরকার স্বীকার করে নিয়েছিল) পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সিলেটকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস করে চলেছেন। মহারাজা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, ত্রিপুরার ব্যাপারে কংগ্রেস উদাসীন এবং কোন তথ্য জানার চেষ্টাও করছে না। বীরবিক্রমের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজাও ভারতভুক্তির দাবিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দিল্লীতে নেহেরু চাকমা রাজার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেন নি। ইতিহাসের জটিল সন্ধিক্ষণে ছোট রাজ্যদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব কোন রকম সহযোগিতা করছে না।

আরেকটা ব্যাপার মহারাজ হৃদয়ঙ্গম করেছেন, পূর্ববঙ্গে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলেই উদ্বাস্তুরা ত্রিপুরার দিকেই ধেয়ে আসবে। দেশবিভাগের সময় দাঙ্গা হতে থাকবে। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী হিন্দুসম্প্রদায়ের চাপ ত্রিপুরার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হবে। বর্তমানে বাঙ্গালী হিন্দুদের থেকে মুসলমানেরই সংখ্যাধিক্য ত্রিপুরায়। দেশ বিভাগের ফলে সিলেট, চাকলা রোশনাবাদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম যদি ভারতের অন্তর্ভু ক্ত হয় তাহলে উদ্বাস্তু-চাপ কমে যাবে। দেশবিভাগ হলে সংখ্যাধিক্য বাঙ্গালী মুসলমানরা ত্রিপুরা ছেড়ে চলে গেলে বাঙ্গালী পুনর্বাসনে কোন অসুবিধা হবে না। ত্রিপুরীদের অস্তিত্বও বিপন্ন হবে না। এরা যে বড় সরল, সাধারণ, অশিক্ষিত, প্রতিযোগিতাবিমুখ। এদের রক্ষাকবচ চাই।

পরদিন ১৫ই মে রাতের দিকে মহারাজের জ্বর বাড়তে লাগলো। দু তিনবার মহারাজ

সংজ্ঞা হারালেন। জ্বরের মধ্যে মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্যবাহাদুর দেববর্মন ভুল বকছেন। কখনো বলছেন, আমি জানি, আমিই ত্রিপুরার শেষ মহারাজ। দেশীয় রাজারা প্রস্তাব রেখেছিলেন, তাঁরা স্বাধীন সত্তা বজায় রাখবেন। আমি বলেছিলাম, আপনারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। এ প্রস্তাব অবাস্তব। ভারতের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যদের অন্তর্ভুক্তি জরুরী। জাতপাত-ধর্মনির্বিশেষে আমরা ভারতীয় এটাই ভাবা উচিৎ। পরস্পরের হাত ধরে নতুন ভারত গড়বো। সব রাজ্যের উন্নতি হবে। আমার ত্রিপুরারও হবে।

আবার গভীর বেদনায় বলছেন, রাজত্ব চাই না, ত্রিপুরার হিত চাই। এমন অসময়ে রাজা হলাম প্রজাহিতৈষণার কোন কাজই করে যেতে পারলাম না। আমার এই মন নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগে যদি রাজা হতে পারতাম তাহলে ত্রিপুরা ইউরোপের কোন দেশ হতো। প্রজাদের কোন বিদ্রোহ বা আন্দোলনই হতো না। আমি তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে স্বাধীনতাও দিতাম। রাজার গোলাম নয়, রাজার বন্ধুহিতৈষী বলে প্রজাদের সম্মান দিতাম। আদেশ দিলেই রাজা হয় না, শাসন পরিচালনক্ষমতাও তাঁর থাকা একান্ত দরকার।

মহারাজার কথা শুনে শিয়রে বসে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা কাঁদছেন। ডাক্তারদের মেলা বসে গেছে। একেক জনের একেক মত। কাঞ্চনপ্রভার মনে হল চিকিৎসা-বিভ্রাট হচ্ছে না তো? তিনি সেক্রেটারী জনেশ ভট্টাচার্যকে ডেকে বললেন, ভট্টাচার্য-মশাই, কাকা লালু কর্তাকে টেলিগ্রাম করে বলুন ডঃ বিধান রায়কে নিয়ে যেন কালই আগরতলায় চলে আসেন। দিল্লী পরে গেলেও চলবে। আমার সব কিছু ভালো ঠেকছে না।

জনেশ ভট্টাচার্য, 'যথা আজ্ঞা মহারানী সাহেবা' বলে টেলিগ্রাম করতে চলে গেলেন।

কলাবতী অনেকক্ষণ ধরে বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। মহারানীর আদেশ পেয়ে ঘরে ঢুকে মহারাজকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। দাদা মহারাজের প্রতি তাঁর অনাস্থা ছিল। রাগ-অভিমান ছিল, কিন্তু ভালোবাসা-শ্রদ্ধাও কম ছিল না। দাদামহারাজ তাকে 'ত্রিপুরার গৌরব' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। নক্ষত্রের সঙ্গে তাঁর বিয়েতে মত না দিয়ে দাদামহারাজ হয়তো ভুলও করেন নি। এ চিন্তাও তার মনে উদয় হল। কতোবার বলেছেন, কলি, নক্ষত্র তোর যোগ্য নয়। এখন নয়, পরে বুঝবি।

মহারানী কাঞ্চনপ্রভার হাতে হাত রেখে কলাবতী ডুকরে উঠলেন, বাউজ মহারানী, হঠাৎ এ কি হল!

মহারানী সান্ত্বনা দেন, ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। কাল বা পরশু ডঃ বিধান রায় আসবেন। কাকা লালু কর্তাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে।

সেদিন সন্ধের মেডিকেল বুলেটিনে জানানো হল, মহারাজা মোটামুটি ভালোই

আছেন। ঔষধ ক্রিয়া করছে।

১৬ই মে কলিকাতায় টেলিগ্রাম পেয়েই লালু কর্তা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ডাঃ বিধান রায়ের বাড়ির দিকে ছুটলেন। গিয়ে শুনলেন, ডাঃ রায় কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ গেছেন। সন্ধের পর ফিরবেন। লালুকর্তা লোক মারফৎ চিঠি লিখে ডাঃ রায়কে বিস্তারিত সব জানিয়ে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন তাড়াতাড়ি চলে আসেন কারণ ১৭ই মে ভোরের ট্রেনে আগরতলা যেতে হবে।

রাজবাড়ি থেকে নানারকম গুজব ছড়াচ্ছে। প্রজারা রাজার সত্যিকার অবস্থা জানতে না পেরে উদ্বিগ্নমুখে জটলা করছে। প্রার্থনা-সভা হচ্ছে। অনেকেই মন্দিরে গিয়ে মহারাজের আরোগ্যকামনায় পুজো দিচ্ছেন। বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা, যাদের মহারাজ আশ্রয় দিয়েছিলেন, অসহায়ের মতো মুখ করে মহারাজের আরোগ্য-সংবাদ শুনতে রাজবাড়ির চারদিক প্রদক্ষিণ করছেন। মানুষের কথাবার্তা, মুখ দেখে বোঝা যায়, মহারাজা কতো জনপ্রিয়। বাঙ্গালী প্রজারা, যারা অনেককাল ধরে ত্রিপুরায় আছেন তাদের ধরে রাখা যাচ্ছে না, হাউ মাউ করে কাঁদছেন। অনেক অনেক বছর ত্রিপুরায় থেকে তাঁরা রাজভক্ত হয়ে গেছেন। কর্তা এবং ঠাকুর পরিবারে অরন্ধন চলছে। সবাই জেনে গেছে মহারাজার অবস্থা খুব ভালো নয়। মেডিকেল বুলেটিনে এতো লুকোছাপা কেন? একটা বেরোচ্ছে তো আরেকটা সময়মতো বেরোচ্ছে না। বুলেটিনের ভাষাও হেঁয়ালিতে ভরা। রাজার কি অসুখ করেছে প্রজারা এখনো জানে না।

মহারাজা যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। এতো ওষুধপত্তর ডাক্তার-কবিরাজ সেবাযত্ন কিছুই কাজ করছে না। কোন ডাক্তার বলছেন, নিউমোনিয়া— আবার অন্যেরা বলছেন, ফুসফুসে সংক্রমণ, লিভার পচন। কোনটা ঠিক কেউ জানে না। মহারানী কাঞ্চনপ্রভা, মহারাজকুমারী কলাবতী সারারাত জেগে মহারাজের সেবা করছেন। জ্ঞান এলে মহারাজা ঘোলা চোখে চারদিকে তাকাবার চেষ্টা করছেন। কিছু একটা বলতে চাইছেন। মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। শুধু একটা মৃদু গর গর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কলাবতী কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে বললেন, দাদা মহারাজ কিছু বলবেন?

কিছু বলতে পারলেন না মহারাজা। ঠোঁটের কোণ থেকে লালা গড়িয়ে পড়লো।

মহারাজা হাত ওঠাতে চাইলেন, সামান্য একটু নড়ে তা বিছানায় ধরাশয়ী হল। বীরবিক্রম একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন দেওয়ালের দিকে। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে কলাবতী দেওয়ালের দিকে তাকালেন। দেওয়ালের ছবিতে ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য। সিংহাসনের নীচে রাখা শালগ্রাম শিলা। মহারাজা

ভগবানের সমান এটা বোঝাতেই শালগ্রাম শিলার ওপর মহারাজের সিংহাসন।

কলাবতী বললেন, ছবিটা আনবো? দেখবেন?

বীরবিক্রম চোখের পলক ফেলে ইশারায় ছবিটা আনতে বললেন। কলাবতী ছবিটা মহারাজার মুখের সামনে ধরলেন। মহারাজার চোখে জল। অপলক ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

১৭ই মে সন্ধে সাড়ে সাতটায় ডাঃ বিধান রায়কে নিয়ে লালুকর্তা উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদে পৌঁছলেন। ডাঃ রায়ের তখন আর কিছু করার ছিল না। নাড়ী টিপে বুঝলেন, বায়ু উর্দ্ধগামী হতে আর বিলম্ব নেই। কষ্ট লাঘব করতে একটা ইনজেকশন দিলেন। সমবেত সবাইকে বললেন, যুবরাজ কিরীটকে ডাকুন। শেষ মুহূর্তে মুখে গঙ্গাজল তুলসী পাতা দিতে হবে। আপনারা সবাই ভগবানের নাম করুন।

প্রভুবাড়ির রাজপুরোহিত গীতাপাঠ শুরু করেন। সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এখন শুধু সময় গোনার কাল।

১৭ই মে ১৯৪৭ রাত্রি ৮.৪০ মিনিটে ত্রিপুরার শেষ মহারাজা পঞ্চ শ্রীল শ্রী যুক্ত ত্রিপুরাধিপতি হিজ হাইনেস ক্যাপ্টেন মহারাজ স্যার বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মন, কে.সি.এস.আই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

প্রজাদের জানান দিতে করুণ সুরে সাইরেন বেজে উঠলো। ক্রন্দনরত হাজার হাজার মানুষ রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে এসে জমায়েত হল শেষ বার দেখবে বলে। সবাই কাঁদছে, মাথা ঠুকছে। যারা মহারাজাকে কোনদিন দেখে নি তারাও কাঁদছে। ত্রিপুরার শেষ রাজাকে শেষ বিদায় জানাতে সবাই কেঁদে আকুল। রাজপতাকা অবনমিত করা হয়েছে। এখন সাইরেনের করুণ কান্না রাজবাড়ির গম্বুজ ভেদ করে ত্রিপুরার আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। সবাই বলাবলি করছে—উনচল্লিশ কোন বয়সই নয়, এত অল্প বয়সে কেউ মারা যায়? এমন আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন, সহৃদয় রাজা ত্রিপুরার সিংহাসনে আর কখনো বসেন নি।



ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর দেববর্মন বাহাদুর পরলোক গমন করলে তাঁর পুত্র কিরীটবিক্রম ত্রিপুরা রাজ্য ও চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। তিনি নাবালক থাকায় ভারত সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী রাজমাতা মহারানী কাঞ্চানপ্রভা দেবীর নেতৃত্বে রাজপ্রতিনিধি শাসন-পরিষদ বা কাউন্সিল অব রিজেন্সী গঠিত হয়। মহাবানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী এই পরিষদের প্রেসিডেন্ট এবং মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর বাহাদুর দেববর্মন (লালুকর্তা) ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। মেজর বঙ্কিমবিহারী দেববর্মন ও মন্ত্রী রাজরত্ন সত্যব্রত মুখার্জী এই পরিষদে সদস্য মনোনীত হন।

রাজন্য-যুগের শেষ লগ্নে চরম জটিল পরিস্থিতিতে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী যে সাহসিকতা ও বুদ্ধির পরিচয় দেন তা সবার প্রশংসা অর্জন করে। চারদিকে নানা ষড়যন্ত্র এবং চরম অস্থিরতা, ঘরে-বাইরে বিভিন্ন দিক থেকে নানা চাপ এবং হুমকি। জনগণের মধ্যে ভারতভুক্তির প্রবল আকাঙক্ষা মাতা মহারানীকে সাহস জোগায়। মহারাজা বীরবিক্রমের সুচিন্তিত শেষ ইচ্ছে কার্যকর করতে তিনি বদ্ধপরিকর হন।

ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার সাতদিন আগে ৮ই আগষ্ট ১৯৪৭ মাতা মহারানী এক ঘোষণায় বৃটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের দিবসটিকে স্মরণীয় উৎসব হিসেবে পালন করার নির্দেশ জারী করেন। ১৩ই আগষ্ট মাতামহারানী মহারাজের শেষ ইচ্ছে ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত-রাষ্ট্রে যোগদানের সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে জানিয়ে দেন। ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ তারিখে সারাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। রাজ্য ও জমিদারির সমস্ত স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতে দুদিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়।

এত চেষ্টার পরও আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরার ভারতভুক্তির চুক্তি সম্পাদন করা যাচ্ছে না। বীরবিক্রম মৃত্যুর আগে মহারানী কাঞ্চনপ্রভাকে ত্রিপুরার রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে গেছেন। তিনি বলে গেছেন ত্রিপুরার ভারতভুক্তির ক্ষেত্রে দুটো বাধাকে অতিক্রম করতে হবে। এক — রাজপরিবারে একটি যে অংশ তীব্র বিরোধিতা করে পাকিস্থানপন্থী ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তাঁদের রুখতে

হবে। দুই—কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতাদের একাংশের সঙ্গে লড়তে হবে, যাঁরা নানা কারণে ত্রিপুরার দায়ভার নিতে অস্বীকার করছেন। মাতা মহারানী রাজ্যের এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে ভারত সরকারকে ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতে অন্তর্ভুক্তির আন্তরিক ইচ্ছের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কোন ফলপ্রসূ উত্তর পাচ্ছেন না। এদিকে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতরাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের অল্পদিন পরেই রাজ্য এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়। ত্রিপুরার সীমান্তস্থিত কুমিল্লার মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের উদ্যোগে ও আগরতলার কতিপয় ব্যক্তির সহযোগিতায় পাকিস্থান ত্রিপুরা-আক্রমণের পরিকল্পনা করে। ত্রিপুরার রাজপরিবার দ্বিধাবিভক্ত এবং দেওয়ান রাজরত্ন সত্যব্রত মুখার্জী পাকিস্থানে যোগ দেবার ইচ্ছে গোপনে প্রকাশ করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ জনসাধারণ পাকিস্থানভুক্তির বিরোধিতা করে পাকিস্থানের আক্রমণ প্রতিহত করতে সংঘবদ্ধ হন। ত্রিপুরা প্রজামণ্ডল পাকিস্থানের আক্রমণের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলে। আগরতলায় চারজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রভাত রায়, জয় সিংহ দেববর্মা, কালু চন্দ ও প্রফুল্ল রায় শিলং-এ মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। ৩রা নভেম্বর ভারতের গোয়েন্দা দপ্তর মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের কার্যকলাপ ও পাকিস্থানের ত্রিপুরা আক্রমণের পরিকল্পনার কথা কেন্দ্রিয় সরকারকে জানায়। ৪ঠা নভেম্বর ১৯৪৭ প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু স্বরাষ্ট্র ও উপ-প্রধানমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলকে ত্রিপুরা সম্পর্কে অবিলম্বে ব্যবস্থা-গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। আসাম সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ পাঠানো হয়। পাকিস্থান সরকারকে টেলিগ্রাম মারফৎ সতর্কিত করা হয়। আসাম থেকে সশস্ত্র বাহিনী ত্রিপুরায় এলে পাকিস্থানের ত্রিপুরা-আক্রমণের পবিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

নক্ষত্রবিক্রম ও পূর্ণেন্দুকিশোর দইভাই রাজবাড়িতে এসে চুপি চুপি কলাবতীর ঘরে প্রবেশ করলেন। কলাবতী তখন কবিতা লিখছিলেন। দুইভাইকে উগ্রমূর্তিতে দেখে তার কলম থেমে যায়। তাঁদের হাতে ধরা কালো পিস্তল আলোতে চক চক করছে। কলাবতী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? তোমরা এখানে?

নক্ষত্র জ্বল জ্বল চোখে বললেন, তোমার দাদা মধ্যম কোথায়?

কলাবতী উত্তর দিলেন, বারে, আমি কী করে জানবো সে কোথায়? কাছে পিঠে আছে কোথাও।

না, তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সে লুকিয়ে আছে।

লুকিয়ে থাকবে কেন?

সব জেনে না বোঝার ভান কোরো না। জান না সে পাকিস্থানপন্থী? তার বহিষ্কারের আদেশ হয়েছে?

জানি।

তবে?

তবে কী?

তাকে তার কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি পেতে হবে।

তোমরা দাদা মধ্যমকে মেরে ফেলতে চাও নাকি? আঁৎকে ওঠেন কলাবতী।

দরকার হলে তাই করবো।

না না, ওটা কোরো না। শাস্তি তাকে পেতে হবে, তবে চরম দণ্ড নয়। পাকিস্থান ওকে ত্রিপুরার রাজা করবে বলেছিল না? তাকে পাকিস্থানে নির্বাসিত কর। আর যেন ত্রিপুরার মুখ না দেখে। তার বিরুদ্ধে তো বহিষ্কারের আদেশ, তাই না?

পূর্ণেন্দুকিশোর এবার কথা বলেন।

ঠিক বলেছো কলাবতী, সারাজীবন সে পাকিস্থানে বসে প্রায়শ্চিত্ত করুক। পস্তাক, বাঁচুক, মরুক। মেরে ফেললে তো তার জীবনদান হবে। কষ্ট দূর করা হবে। আমিও চাই সে কষ্টে বাঁচুক, তিলে তিলে মরুক।

নক্ষত্র এবার কলাবতীর ঘনিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি বলতে পারো কলি, কোথায় ও লুকিয়ে থাকতে পারে?

কলাবতী কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, এখন তো সবে সন্ধে। রাত্রি হলে দাদা মধ্যম কোথায় যেতে পারে আঁচ করতে পারি।

কোথায়? আমাদের বলো?

রাত্রি হলে দাদা মধ্যমের মেয়েমানুষ ছাড়া চলে না। তোমরা আগরতলায় তার সব ডেরায় খোঁজ নিয়েছো?

যতটা জানি নিয়েছি। বললেন পূর্ণেন্দুকিশোর।

একটু চিন্তা করে কলাবতী বললেন, তার মানে আগরতলায় সে নেই। আচ্ছা, পুরান হাবেলীতে খোঁজ নিয়েছো?

পূর্ণেন্দ বললেন, না ওটার খোঁজ জানি না। কোথায় ওটা?

কলাবতী বললেন, সে কি আমিও জানি? তবে ওখানকার লোকেরা ঠিকই বলতে পারবে।

ঠিক বলেছো-বলে নক্ষত্রবিক্রম এবং পূর্ণেন্দুকিশোর বেরিয়ে যাবার আগে কলাবতী আবার তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিলেন—মৃত্যুদণ্ড নয়, নির্বাসনদণ্ড দাও।

পরের ঘটনা নক্ষত্রের কাছ থেকে শুনেছেন কলাবতী। এক ট্রাক সশস্ত্র লোকজন নিয়ে নক্ষত্র ও পূর্ণেন্দু পুরান হাবেলীতে (পুরান আগরতলা) যান। ওখানকার বাসিন্দাদের জিজ্ঞেস করতেই দুর্জয় কর্তার আস্তানার সন্ধান মেলে। বিরাট এলাকা নিয়ে বাগানবাড়ি। খড়ের ছাউনি দেয়া একটা ঘরে মদ খেতে খেতে দুর্জয় কর্তা উলঙ্গ নাচ দেখছেন। গ্রামাফোনে গান বাজছে, মেয়েরা উত্তেজক ভঙ্গী করে নাচছে। মাঝে মধ্যে দুর্জয় কর্তার গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—এই তুই থেমে গেলি কেন? বুকটাকে দোলা, আরো দোলা। ঘরে কোন আলো নেই। পঞ্চাশাধিক টর্চলাইট বিভিন্ন কোণে উপরে নীচে জ্বেলে রেখে নাচ হচ্ছে। একটা বড় টর্চলাইট দুর্জয় কর্তার হাতে। কাউকে বিশেষ ভাবে দেখতে চাইলে জ্বালাচ্ছেন, নেভাচ্ছেন। পূর্ণেন্দু কিশোরের মনে হল একজন অসুস্থ মস্তিষ্ক, নোংরা লোককে ধাওয়া করতে তাঁরা এসেছেন। সবাই বেড়ার ফাঁক দিয়ে নৃত্যদৃশ্য দেখছেন। কেউ কেউ মজে গেছেন মনে হয়। আক্রমণ করার কোন লক্ষণই নেই। পূর্ণেন্দু ফিস ফিস করে দাদাকে বললেন, অপেক্ষা কিসের? চল ওকে বন্দি করি। টনক নড়লো নক্ষত্রবিক্রমের। এক হুঙ্কার দিয়ে পিস্তল হাতে ঘরে ঢুকলেন তিনি। দুর্জয় কর্তার দিকে পিস্তল তাক করে বললেন, হ্যাণ্ডস আপ।

মেয়েগুলো এমন পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তারা দৌঁড়ে বাইরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। দুর্জয় কর্তা হতভম্বের মতো তাকিয়ে আছেন নক্ষত্রের দিকে। নক্ষত্রের হাতের পিস্তল দুর্জয় কর্তার মাথার থেকে এক ফুট দূরে। ট্রিগারে আঙ্গুল। দুর্জয় কর্তা ভয়ে তোৎলাতে তোৎলাতে বললেন, কেন এসেছো তোমরা? আমার রাত্রিটাই মাটি করে দিলে?

পূর্ণেন্দু টিটকিরি দিয়ে বললেন, মুসলমান মেয়েদের উলঙ্গ নাচ যাতে দেখতে পাও তার জন্যে তোমাকে পাকিস্থানে নিয়ে যাবো। তবে তোমার যন্ত্রটা অক্ষত থাকবে না। ওরা কেটে নেবে।

কী চাও তোমরা? এতো লোক নিয়ে কেন এসেছো? আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছে? রুখে দাঁড়ান দুর্জয় কর্তা।

নক্ষত্র বললেন, বাড়াবাড়ি করলে মাথার খুলি উড়ে যাবে। চুপচাপ আমাদের সঙ্গে এসো। অনেক দূর যেতে হবে।

দুর্জয় কর্তা ডুকরে উঠেন, কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে তোমরা?

কেন, পাকিস্থানে? বর্ডার সুনসান খোলা। তুমি পাকিস্থানপন্থী। পাকিস্থানই তো তোমার ঘর। তোমাকে ঘরে পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। পাকিস্থান যেতে তোমার আপত্তি হওয়া তো উচিৎ নয়। পূর্ণেন্দুকিশোর হাসতে হাসতে বললেন।

আর্তনাদ করে ওঠেন দুর্জয় কর্তা—না, তোমরা বড় দাদার সাথে এমন ব্যবহার করতে পারো না।

বড় দাদা বড়র মতো ব্যবহার না করলে নিশ্চয়ই পারি। তুমি ত্রিপুরার শত্রু। তোমার জন্যে ত্রিপুরার ক্ষতি হোক, ত্রিপুরাবাসী চায় না। এবার উঠে পড়ো। এক কাপড়ে তোমাকে যেতে হবে। ত্রিপুরার কোনো জিনিস নিয়ে তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না। কপর্দকহীন যাবে তুমি। পাকিস্থান তো তোমাকে জামাই-আদরে রাখবে, ভয় কি? চলো, চলো, উঠে পড়ো। তাগাদা দেন নক্ষত্র।

দুজনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দুর্জয়কর্তা গ্লাসের মদটুক এক ঢোকে শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, একা আমাকে নিয়ে যাবে? সত্যব্রত মুখার্জীকে সঙ্গে নেবে না?

পূর্ণেন্দুকিশোর স্মিত হেসে বললেন, তার সঙ্গ চাও নাকি? দুজনে মিলে পাকিস্থানে বসে ত্রিপুরা-আক্রমণের প্ল্যান বানাতে চাও, তাই না? ওটা হবে না। মাথা খারাপ! তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে রাখা মানে ভবিষ্যতের অমঙ্গলকে ডেকে আনা। তাছাড়া ওকে বরখাস্ত করা হয়েছে, বহিষ্কার করা হয় নি। ঘরে অন্তরীণ থাকবে। ত্রিপুরাবাসী তার ওপর কড়া নজর রাখবে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, এবার ট্রাকে উঠে পড়ো।

দু'রাত্রি ট্রাক সমানে চললো। রাস্তাঘাটের অবস্থা অবর্ণনীয়। তৃতীয় দিন সিলেট জেলার সীমানায় এসেট্রাক থামলো। সীমানা এখন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। কোন চেকপোষ্টও নেই। পূর্ব পাকিস্থানের অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেলেন নক্ষত্ররা। কেউ বাধা দিলো না। হিন্দু-মুসলমান দুপক্ষই সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। সিলেট জেলার অভ্যন্তরে এসে দুর্জয় কর্তা কে ট্রাক থেকে নামিয়ে দেওয়া হল। নক্ষত্র হুমকি দিয়ে বললেন, কোনদিন ত্রিপুরায় আবার যদি তোমার মুখ দেখি, ধড় থেকে গলা আলাদা হয়ে যাবে। সাবধান, সে চেষ্টা কোরো না।

তিনদিন সমানে এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ী রাস্তায় না খেতে পেয়ে চলতে চলতে শরীর আর ধকল নিতে পারছিল না। গাড়ীর হেডলাইটে নক্ষত্ররা দেখলেন, দুর্জয় কর্তা মাটিতে ঘাসের উপর চিৎপাত শুয়ে আছেন। আকাশের দিকে মুখ।



সময় হল অবিরাম মুহূর্তের ওপর মুহূর্তের ঝাঁপিয়ে পড়া এবং লুপ্ত হয়ে যাওয়া অতীত। নদীর স্রোতে যে জল স্পর্শ করা হয় তা সব-শেষের ঢেউ, যা চলে যায় হাতের ফাঁক দিয়ে, আবার সেই তো সর্বপ্রথম ঢেউ যা ধরা দিয়েছিলো— এটাই বর্তমান সময়ের পরিমাপ। যে-ঢেউ হাতের ছোঁয়ার অপেক্ষায় থাকে তা-ই ভবিষ্যৎ। সময় অস্থির। মনের অবস্থাও স্থির নয়, এক জায়গায় থেমে থাকে না। কলাবতী নেতিবাচক চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেন। ভাবেন, অভিজ্ঞতা জীবনকে প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত করে। অতৃপ্তির ক্ষত কখনো শুকোয় না। সব পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যন্ত্রণার জন্ম দেয়। যা আছে, তাতে তৃপ্ত হলে অখন্ড তৃপ্তি লাভ হয়। বিবাহিত জীবনে ভালবাসা পেতেই হবে এ আশা না করলেই কি নয়? আশার অতীত ভালোবাসা যদি অজান্তে ধরা দেয়, সেই তো পরম পাওয়া। তীরের দিকে তাকিয়ে থাকলে নতুন সমুদ্র আবিষ্কার করা যায় না। যে আলো-কে জানে, পাশাপাশি ছায়াকেও রাখে।

কলাবতী নিজেকে বিচার করে দেখেছেন, তার মধ্যে হ্যামলেটের দ্বিধাগ্রস্ত ভাব কাজ করে। লক্ষ্য স্থির করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। অতিরিক্ত হ্যাঁ-না কার্য-সিদ্ধিকারক হয় না। হারাবার ভয় মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। প্রেম ছিল, আছে, থাকবে। কেবল তার কপালে আছে কিনা, এ ভাবনা নেতিবাচক।

সময়ের এই ঘাত-প্রতিঘাতে, আত্মবিশ্লেষণে, তৃপ্তি-অতৃপ্তির সীমারেখায় দাঁড়িয়ে, চিন্তনে, মননশীলতায় কলাবতী নিষিদ্ধ ফলের দিকেই হাত বাড়ালেন। খেলেও হা-পিত্যেশ, না খেলেও হা-পিত্যেশ, এমন পরিস্থিতিতে কলাবতী তার বিশ্বাসকে মূলধন করে নক্ষত্রের সঙ্গে তার বিয়েতে সম্মতি জানালেন।

আজ কলাবতীর বিয়ে। না সানাই, না বরপক্ষ, না কন্যাপক্ষ। অল্প কয়েকজন বিয়েতে সামিল হবেন এইমাত্র। মহারাজার মৃত্যুর পর ছ'মাস অতিবাহিত হয়েছে। শোকের চিহ্ন এখনো রাজ্যের সর্বত্র। কিছুদিন আগে কিশোরীলালের মন্দিরের কাজ শেষ হয়েছে। মন্দিরটি তৈরী করিয়েছেন মহারাজকুমারী কলাবতী দেবী। ওখানেই

আজ কলাবতীর বিয়ে। রাজপুরোহিত বিয়ের পৌরহিত্য করতে অস্বীকার করেছেন। মন্দিরের নিয়মিত পূজারীই বিয়ের মন্ত্রপাঠ করবেন স্থির হয়েছে। বিয়ের সময় মন্দিরে কিশোরীলালের বাঁশী নীরবে বাজবে।

ঘুম থেকে উঠে দিনটাকে অন্যদিনের মতোই মনে হল কলাবতীর। আজ তার বিয়ে, নতুন জীবনের সুরু এই ভাবটাই মনে কোন রেখাপাত করছে না। অজানা আশঙ্কা মনে ভিড় করছে, তাও না। কলাবতী কেমন একটা বোধহীনতা অনুভব করছেন। যেন নিজেকে ভবিতব্যের হাতে সঁপে দিয়েছেন, এমন একটা ভাব। যেন এই জীবনটা তার নয়। যা কপালে আছে তা মেনে নিতে কলাবতী মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

শেষ পর্যন্ত তেত্রিশ বছর বয়সে তার বিয়ের ফুল ফুটলো। বিয়ের সানাই যখন মাঝপথে ফিরে গিয়েছিল কলাবতী সবাইকে সাক্ষী রেখে কিশোরীলালের গলায় মালা পরিয়েছিলেন। নক্ষত্রের মধ্যে কিশোরীলালকে পেতে রোমান্টিক ভাবনায় মনে মনে কতো ছবি এঁকেছিলেন। একটা ছবির সঙ্গেও নক্ষত্রকে মেলাতে না পেরে হতাশ কলাবতী বার বার নক্ষত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু আর পারলেন না। নক্ষত্রের উপর্যুপরি জিদের কাছে অবশেষে হার মানতে হল কলাবতীকে।

দাদা মহারাজ মারা গেছেন বেশিদিন হয়নি। এখনো শোক পালিত হচ্ছে। শোকের সময় এ বিয়ে রাজপরিবারের কেউই মেনে নিতে পারছেন না। ওরা ধিক্কার দিচ্ছেন। কলাবতীকে বে-সরম বলছেন। নক্ষত্রকে বলছেন মেয়েবাজ। একটা বউকে মেরে ফেলেছে, আরেকটা মারবার তালে আছে। সব কথা কানে আসে কলাবতীর। নক্ষত্রের ভাই বোন, তার আপন ভাইয়েরা এ বিয়ে বয়কট করেছেন। বলছেন, কলাবতী রাজপরিবারের লজ্জা।

এই তো সেদিন নক্ষত্র এসে আবার সেই পুরনো বিয়ের কথা পাড়লেন। কলাবতীর কি হয়েছিল কে জানে, এতোদিনের ভাবনাচিন্তাকে দূরে নিক্ষেপ করে বলে উঠলেন, বিয়ে করতে রাজি আছি, কিন্তু একটা শর্তে।

কলাবতীর কথা শুনে অবাক হয়েছিলেন নক্ষত্র। বললেন, বিয়ের জন্য শর্ত কেন? আমি কি তোমার কোন কথা রাখি না?

কলাবতী কথার খেই ধরে বললেন, ওসব বাজে কথা। চিঠিতে যা সব লিখেছিলে তা-ও? বলো, তোমার স্ত্রীর ওপর রাগ করে বিয়ে করো নি তুমি অল্পবয়সী ওই মেয়েটাকে? মোহগ্রস্ত হয়েছিলে, আমার দাদারা তোমার বিয়ে দিয়েছেন, আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করতে। কিন্তু তুমি কেন বিয়ে করেছিলে? আমার সঙ্গে তোমার মেলামেশা দাদারা পছন্দ করতেন না। এখন আমি কাউকে গ্রাহ্য না করে

বিয়ে করতে রাজি আছি। এঁরা যখন আমার কথা ভাবেন না, আমি তাঁদের ভাবিয়ে তুলবো বৈকি!

নক্ষত্র দুঃখিত স্বরে বললেন, শুধু এর জন্যে বিয়ে করবে? আমাকে ভালোবাস না?

কলাবতী ধীরে ধীরে বলেন, তোমাকে কাছে পেতে ভালো লাগে। না দেখতে পেলে অস্থির হই। একে তো ভালোবাসাই বলে, তাই না?

আমি জানি না, তুমি তোমার মনকে বিচার কর।

মন যে হাওয়ার পাখি, কোন দিকে যাবে নিজেই জানে না।

মনকে না জেনে বিয়েতে রাজি কেন তবে?

ঐ যে বললাম সবাইকে ভাবিয়ে তুলতে চাই।

এটা কোন উত্তর হল না। তুমি আমাকে দয়া করে বিয়ে করছো?

কেউ কাউকে দয়া করতে পারে না। হাওয়ার পাখিরও নীড় আছে। তেত্রিশ বছর বয়সে আমার মনে হল আমারও একটা আশ্রয় দরকার। তবে বিনা শর্তে নয়।

শর্তসাপেক্ষ বিয়ে মানে শেকল-বাঁধা বিবাহিত জীবন। ওখানে ভালোবাসার স্থান কোথায়?

ভালোবাসাকে জায়গা দেবার জন্যই তো শর্তের আশ্রয় নিচ্ছি। কর্তা, ভালোবাসা শ্রদ্ধা থেকে উৎপন্ন হয়। রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ হই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনার উদয় হয়। মোহগ্রস্ত হই। মানুষের আচার-ব্যবহার গুণাবলী যা শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে রূপের সঙ্গে তা যুক্ত হলে রাজযোগ হয়। ভালোবাসাকে ডাকতে হয় না। এমনি আসে। আবার যেখানে রূপ নেই শুধু গুণ আছে সেখানে ভালোবাসা আরো পাকাপোক্ত। প্রেম সেখানে নিকষিত হেম। প্রেমিক-প্রেমিকা একে অন্যের পরিপূরক। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় ডুবো ডুবো সরোবর হয়।

তুমি কী বলতে চাইছো? কৃষ্ণ কেমন— যার মনে যেমন?

ঠিক তাই। কী চোখে তুমি ভালোবাসার জনকে দেখছো তার ওপরই সম্পর্ক নির্ভর করে। শ্রদ্ধা এবং ঘৃণা এপিঠ-ওপিঠ। প্রেম তো পুজোর মতো। যাকে শ্রদ্ধা করা যায় না তাকে পুজোও করা যায় না। ঘৃণার জন্ম যেন না হয় তার জন্যেই শর্ত। আমি আমাদের সম্পর্কটাকে পারস্পরিক শ্রদ্ধার বুনিয়াদে দাঁড় করাতে চাই। ভালোবাসার তখন খামতি থাকবে না।

বলো, কী তোমার শর্ত?

একটাই শর্ত — বিশ্বাস।

মানে?

তুমি আমার বিশ্বাসের মর্যাদা দেবে, আমি তোমার বিশ্বাসের মর্যাদা দেবো।

এতো সহজ শর্ত আশা করেন নি নক্ষত্র। হেসে বললেন, এটা কোন শর্ত হল? বিবাহিত জীবনে এটাই তো স্বাভাবিক।

না কর্তা না, অতো সহজ ব্যাপার নয়। কলাবতী বলতে থাকেন, বিশ্বাস মানে যেখানে সন্দেহের কাঁটা নেই। বিশ্বাস মানে খোলা বই, প্রতিটি অক্ষর পড়তে পারি। ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'ট্রান্সপারেন্সী'। আমাদের সম্পর্কে ওটা বিশেষ ভাবে দরকার। আমার স্বাধীনতায় তুমি হস্তক্ষেপ করবে না। তোমার স্বাধীনতায়ও আমি হস্তক্ষেপ করবো না, কিন্তু স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। তোমার উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমি ভয় করি। আমার ভরণ-পোষণেই তোমার দায়-দায়িত্ব শেষ নয়, আমি আরো কিছু আশা করি তোমার কাছ থেকে। অবহেলা, করুণা আমার ধাতে সয় না। নারীর মর্যাদাটুকু চাই। বিশ্বাসভঙ্গে নারীর মর্যাদাহানি হয়। তোমাকে উচ্ছৃঙ্খল জীবন পরিত্যাগ করতে হবে।

নক্ষত্র এবার রাগ দেখায়।

তার মানে তুমি আমাকে উচ্ছৃঙ্খল বলছো? বলছো উচ্ছৃঙ্খল বলে আমি বিশ্বাসের যোগ্য নই?

ঠিক ধরেছো। উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রহীন লোক বিশ্বাসের যোগ্য নয়। বিশ্বাস তাঁদেরই করা যায় যাঁরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করে।

তুমি কি পরোক্ষে আমাকে সেবাদাসীদের ঘরে যেতে মানা করছো?

না গো, কর্তা না। তুমি আমাকে বোঝার চেষ্টা কর। সেবাদাসী তোমার স্বাভাবিক জীবনের অঙ্গ। আমি মানা করতে যাবো কেন? তাদের তুমি শরীর দাও আমাকে শুধু মনটা দাও। মনটা দিলেই বিশ্বাস ধরা দেবে। শরীর-ভাগাভাগিতে আমার আপত্তি নেই যতোক্ষণ তুমি আমার আছো। এই যে এতো ভালোবাসি ভালোবাসি বলছো এ ভালোবাসা বিয়ের পর থাকবে তো? তুমি আমাকে ভালোবাসো, এ আমি বিশ্বাস করতে চাই। আমার এ বিশ্বাসের কথাই এতোক্ষণ ধরে বলবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এ বিশ্বাস যেন ভঙ্গ না হয়, এ শর্তটুকু মাত্র বিয়ের সঙ্গে জুড়ে দিলাম।

আলবৎ বিশ্বাস থাকবে। নক্ষত্র জোর দিয়ে বলে ওঠেন।

তাহলে বিয়ের প্রস্তুতি শুরু কর। কলাবতী পরম বিশ্বাসে নক্ষত্রের বুকে মাথা

রাখেন। নক্ষত্র মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে তাকে আশ্বস্ত করেন। পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজে থাকেন কলাবতী। মনের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ক্লান্ত কলাবতীর চোখে ঘুম নেমেছে। আয় ঘুম, ঘুম আয়......

মহারাসের দিন নক্ষত্রের প্রেম-নিবেদনের পর থেকে নক্ষত্রকে দাদা নক্ষত্র বলে আর ডাকেন না। কর্তা মানুষ তাই কর্তা বলে ডাকেন। ইচ্ছে হলে নাম ধরেও ডাকেন। সেদিন থেকে নক্ষত্র যখন আগরতলায় থাকতেন রোজ ওদের মহলে যেতেন কলাবতী। নক্ষত্র এসে ওকে নিয়ে যেতেন। অনেক রাত অবধি আড্ডা হোত। দাদা মধ্যম দুর্জয় কর্তার বাড়িতেও আড্ডা জমতো। একদিন তিনি আপত্তি তুললেন। কলাবতী দাদা মধ্যমকে বললেন, আমি নক্ষত্রের সঙ্গে যাচ্ছি। তোমার আপত্তি থাকলে আমার কিছু করার নেই।

চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেলো। মাকে বললেন, আমার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। সব জেনে শুনেই আমি ওঁকে বিয়ে করছি।

মা-র চোখের জল বাঁধ মানলো না। মহামান্য দাদা মহারাজ কলাবতীর চিঠি পড়ে রাগে ফেটে পড়েছেন। কলাবতী চিঠিতে লিখেছেন—

শত কোটি প্রণামপূর্বক নিবেদন—

আমার বন্ধু স্বজাতি, আত্মীয়ও বটে; আমি তাঁকে ভালোবাসি। তিনি সুশিক্ষিত, রূপবান। আমরা বিয়ে করবো মনস্থ করেছি। আপনার এক পয়সাও খরচ হবে না, পিতৃরাজ্যে আরামেই থাকবো। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করবেন আশা করা যায়। আপনার মামার ছেলে, মামীর ছেলের চেয়ে কাকার ছেলেই ভালো মনে হল। আমাকে অন্য বোনদের মতো বাইরে বিয়ে দিতে পারলেন না, স্টেটে বিয়ে দিতে হতো। আর তো ভাবনা নেই। আমি ইচ্ছে করলে খৃষ্টান, মুসলমান যা ইচ্ছে হতে পারি। আপনার সমাজ স্বপরিবার নিয়ে সম্মানে থাকুন। আমার ন্যায্য প্রাপ্য পেলে কোন দাবি থাকে না। ন্যায্য প্রাপ্য হতে যদি আমার দাদাদের মতো বঞ্চিত করেন, অন্য পথে যেতে বাধ্য হবো।

কলাবতী পরে জেনেছেন, দাদা মহারাজ চিঠিটা পড়ে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। বৈমাত্রেয় দাদা হলেও কলাবতী মহারাজকে শ্রদ্ধা করতেন তাঁর বহু গুণের জন্যে। কি চমৎকার কবিতা, গান লেখেন। অসামান্য সঙ্গীতজ্ঞ। সেতার ও বাঁশীতে রেকর্ড করেছেন। জয়াবতী নামে যে ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন তাতে জয়াবতীর চরিত্রে রাজ-অন্দরে কতোবার অভিনয় করেছেন কলাবতী। তিনি উপযুক্ত রাজা ছিলেন।

মনটাও বিরাট ছিল। আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন মহারাজ বীরবিক্রম। মহারানীদের সমান মাসোহারা দেওয়া হল কলাবতীকে কিন্তু বিয়েটা অনুমোদন করলেন না। কলাবতীকে বলা হল নক্ষত্রের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটা ছাড়া সে স্বাধীন যেমন খুশি জীবন কাটাতে পারে। অর্থাৎ কলাবতীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেয়া হবে। উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা তো কলাবতীর কাম্য ছিল না। তিনি তো জন্ম থেকেই মনের দিক থেকে স্বাধীন। যা ভালো লাগে তাই তো করে এসেছেন এতোদিন।

ভাবনার সূত্র বাধা পায়। সত্যিই কি তিনি স্বাধীন? স্বাধীন ছিলেন তো দাদা মহারাজ জীবিত থাকতে বিয়ে করার সাহস জোগালো না কেন? সেই তো দাদা মহারাজের মৃত্যুর পর বিয়ে করতে যাচ্ছেন। মুখে বলা সহজ, কাজে করে দেখানো অনেক কঠিন। বিয়ে করছেন কিন্তু পরিবারের কেউ এ বিয়েকে সমর্থন করছেন না বলে তার মর্মপীড়া হচ্ছে কেন? তার মনে বিয়ের আনন্দ কোথায়? ভিখিরীর বিয়েতেও সবাই মিলে আনন্দ করে। সবার অমতে বিয়ে করতে গিয়ে স্ববিরোধিতায় ভুগছেন কলাবতী। কলাবতীর চোখে জল কেন? এ তো আনন্দাশ্রু নয়, এ যে এক অপমানিত, লাঞ্ছিত, সমাজবিরোধী নারীর অশ্রুত কান্না। এমন নারী যে নিজেই জানেন না তিনি কী করতে যাচ্ছেন, দ্বিধা যার অন্তর জুড়ে বিরাজ করছে।

এমন সময় জীবনকুমারী দেবী হাতে একটা থালা নিয়ে এলেন। পেছনে ধাই মা। ধাইমার পেছন দিকে তাকালেন কলাবতী। না, আর কেউ আসেন নি। কোন রাজকুমার, কুমারী এই অসামাজিক বিয়েতে সামিল হবেন না।

জীবনকুমারী দেবী কাঁদতে কাঁদতে বিড় বিড় করে বলছেন, বাপের জন্মে এমন বিয়ে দেখি নি। মহারাজকুমারীর বিয়ে অথচ সানাই ব্যাণ্ডপার্টি নেই, হাতি-ঘোড়া নেই, লোক-লস্কর নেই, এ যেন চুরি করে বিয়ে হচ্ছে।

মাগো! বলে এতোক্ষণ বাদে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন কলাবতী। তার বিয়ে যে এমন একটা অবাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টি করবে ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেন নি কলাবতী। সবার অমতে বিয়ে করার যে মনের জোর তার ছিল সহসা তা দিশাহীন হয়ে গেছে। একেই বলে জন্মগত সংস্কার যা একটু একটু করে মানুষের মনকে প্রভাবিত করে। ভালো-মন্দ শেখায়। স্বাধীন বলে চেঁচালেও এর থেকে মুক্তি নেই মানুষের। মানুষই নিজেকে অদৃশ্য শেকলে বেঁধে রেখেছে। ধাইমাও ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। তার আদরের ঝাপুলি, রাজবাড়ির সব চাইতে রূপবতী গুণবতী কন্যা নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিয়ে করতে চলেছেন। জাঁকজমকে যাঁর জীবন ছিল ভরপুর, তাঁর বিয়ে হবে তাঁরই হাতে গড়া এক মন্দিরে যেখানে বাদ্য বাজবে না, অতিথি অভ্যাগতরা থাকবেন না, হৈ হুল্লোড়

হবে না। থাকবেন জনাকয় বিষণ্ন লোক যাঁরা গম্ভীর হয়ে সাক্ষীস্বরূপ বিয়েটা দেখবেন।

জীবনকুমারী দেবী বললেন, আজ তোর বিয়ে মা, আজকের দিনে কাঁদতে নেই, অমঙ্গল হয়। ওঠ, বরের বাড়ি থেকে গায়ে হলুদ এসে গেছে যে।

কলাবতী উঠে বসলেন। জীবনকুমারী দেবীর মনে হল আনন্দের দিনে নিরানন্দ হলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করে না। মনে মনে তিনি ভগবানকে ডাকেন।

ঠাকুর, বড় দুখী মেয়ে আমার কলাবতী, একটুও সুখ পায় নি, তাকে সুখের মুখ দেখাও ঠাকুর!

লালু কর্তা গোমড়া মুখে বসে আছেন। নক্ষত্রের ঘরে সানাই বাজছে। সকালে উঠে গায়ে হলুদ লাগিযে স্নান করে হলুদ পাঠিয়ে দিয়েছেন রাজবাড়িতে। আজ তাঁর আনন্দ ধরে না। শিস দিয়ে গান গাইছেন। পূর্ণেন্দুর সঙ্গে মজা করছেন। লালু কর্তা যে তাঁকে বিয়ের পর অন্যত্র ব্যবস্থা করতে বলেছেন, গায়েই মাখছেন না নক্ষত্র। তাঁর চোখের সামনে কেবল কলাবতীর মুখ ভাসছে। কখন বিয়েটা হবে, তাঁর আর তর সইছে না। দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকালেন। তাঁব মনে হল ঘড়ির কাঁটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সময় কি স্থির হয়ে গেছে? আলমারি খুলে বিয়ের পোষাক বিছানায় রাখলেন। ছাই রঙের জরির আচকান ফুল ফুল দেওয়া। গোলাপী পাগড়ী, যোধপুরী পায়জামা, কটিবন্ধ, তলোয়ার। আদর করে সব কিছুতে হাত বোলাতে ইচ্ছে করছে।

কলাবতী এখন কী করছেন ভাবতে ইচ্ছে হল তাঁর। হলুদ মাখামাখি নিয়ে রাজবাড়িতে নির্ঘাৎ শোরগোল পড়ে গেছে। কলাবতীর হলুদমাখা মুখটা কেমন দেখতে হবে ভাবতেই ফিক করে হেসে ফেললেন। সেই ছেলেবেলা থেকে প্রেম, এতদিনে বাঞ্ছা পূরণ হল। কী করবেন বুঝতে পারছেন না। কেমন একটা অস্থিরতা-বোধ তাঁকে সুস্থির হতে দিচ্ছে না। প্রাণখুলে গান গাইতে ইচ্ছে করছে, নাচতে ইচ্ছে করছে। এমন আনন্দ-আনন্দ লাগছে যে পাগল হবার জোগাড়। যাঁর সঙ্গে আনন্দ ভাগ করতে পারতেন সে তো এখন কনে বৌ হয়ে লজ্জাবনত স্মিত মুখে সহেলীদের নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। আর নক্ষত্র একা-একা মহলে বসে সময় গুনছেন। বোন নবীনা এখানে আছেন। একবারও এদিক ঘেঁষলেন না। উইশও করলেন না। কে কী করলো না করলো তাঁর কিছু যায় আসে না। কলাবতীকে এমন আদর করবেন যে এতোদিনের সব দুঃখ ভুলিয়ে দেবেন।

আনন্দে এতো মশগুল ছিলেন যে কখন পূর্ণেন্দু এসে তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন, টেরও পাননি।

পূর্ণেন্দু নক্ষত্রের আনন্দের আতিশয্য দেখে ফুটকি কেটে বললেন, বড় দাদা, আনন্দে আটখানা দেখছি। এটা কি প্রথম বিয়ে নাকি? অতো লাফালাফির কী আছে?

নক্ষত্র লজ্জা পেয়ে বললেন, কই, কিছু না তো। আমি আবার কী করলাম?

পূর্ণেন্দু আস্তে আস্তে বললেন, শোন একটা খবর আছে। দাদা দুর্জয় গেঁদু মিঞার সাহায্যে হবিগঞ্জ থেকে কুমিল্লায় চলে এসেছেন। যে কোন মুহূর্তে ত্রিপুরায় ঢুকতে পারেন।

ঢুকলেই হল? মাথা কেটে নেবো না?

অতো সোজা নয়। ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা কর। ত্রিপুরাই প্রথম দেশীয় রাজ্য যে ভারতে অন্তর্ভুক্তির জন্যে আবেদন করেছিল অথচ প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ব্যাপারটাকে ঝুলিয়ে রেখেছেন। তার মানে যদি এই হয় যে ভারত সরকার ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তি চান না, তাহলে দাদা দুর্জয় ত্রিপুরার অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।

মাতা মহারানী তো ব্যাপারটা দেখছেন। অতো ভেবে কাজ নেই। আজ আমি সব চিন্তা থেকে ছুটি নিয়েছি। আজ আমার বিয়ে, ভুলে গেলে চলবে?

সরি, সরি, বড় দাদা। টিটকিরির সুরে বলেন পূর্ণেন্দু— আজ তোমার বিয়ে বেমালুম ভুলে গেছি। স্বপ্ন দেখ, আমি যাই।

পূর্ণেন্দু বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। নক্ষত্র গম্ভীর হয়ে ভাবছেন, সবাই কেন এ বিয়েকে অসমর্থন করছেন? প্রেম-ভালোবাসা কি পাপ? তাঁরা কি কোন অন্যায় করেছেন যে শাস্তি পেতে হবে? দুটি হৃদয়ের মিলনে অন্যদের তো শরিক হওয়া উচিৎ। ঈর্ষা, ঈর্ষা, ঈর্ষা। তাঁদের তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না। তবে?

কিশোরীলালের মন্দির আজ আলোর মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। মন্দিরের চাতালে বাঁশের ঝালর ঝাপটি দিয়ে বেদী তৈরী করে নানা রংয়ের পঁচিশটি চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে। কলাবতীর পুতুল-বিয়েতে কতো আয়োজন ছিল। রাজবাড়িতে যেভাবে বিয়ে হয় তার প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করে কৃষ্ণাদিদির পুত্রের সঙ্গে তার কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন ছেলেবেলায়। অদৃষ্টের পরিহাস, নিজের বিয়েতে কোন নিয়মই পালন করা গেল না। নমঃ নমঃ করেই বিয়েটা সারা হবে।

বিয়ের লগ্ন সন্ধে সাড়ে সাতটায়। ঘোড়ায় চড়ে টগবগ করতে করতে নক্ষত্র এলেন। অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে কন্যাপক্ষের সাতজন লোক মাত্র দাঁড়িয়ে। কর্ণকর্তা, ভানু বিক্রম, আর ঠাকুর পরিবারের পাঁচজন। বরযাত্রী প্রায় পঁচিশজন এসেছেন। বেশির ভাগই মিলিটারির লোক। কন্যার দাদা সুকুমার কর্তা আসেন নি।

আরেক ভাই দুর্জয় কর্তা দেশ থেকে বহিষ্কৃত। রাজবাড়ি থেকে বলতে গেলে কেউই আসেন নি। নক্ষত্রের মেজাজ বিগড়ে গেলো। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে চাতালের এককোণে সোফায় বসলেন। মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টি তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করছিল। মনে মনে কলাবতীকে দোষারোপ করলেন। সমস্ত আইডিয়া কলাবতীর। তাঁর এক কথা, সবার অমতে জাঁকজমক করে বিয়ে করলে লোক-হাসানো হবে। তা ছাড়া নিমন্ত্রিতরা যদি বিয়েতে যোগ না দেন, বয়কট করেন, সব পণ্ডশ্রম হবে। বুড়ো বয়সে বিয়ে হচ্ছে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে কিশোরীলালকে সাক্ষী রেখে অতি সাধারণভাবে বিয়ে করাটাই উচিৎ হবে। দোষারোপ এবার প্রশস্তিতে বদলে গেল। সঠিক চিন্তা করেছেন কলাবতী। জাঁকজমক করতে গেলে, এখন যা পরিস্থিতি, হয়তো সবাই ক্ষেপে গিয়ে বিয়েটাই হতে দিত না। সব আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, কলাবতীর কথাই ঠিক, কেউ আসবে না।

কলাবতী, মাতা মহারানী জীবনকুমারী দেবী, ধাইমা মন্দিরের ভেতরে কিশোরীলালের বিগ্রহের সামনে বসে আছেন। কলাবতীর পরনে সোনার জরির ফুল-আঁকা সাদা বেনারসী শাড়ি। মাথায় ফুলের মুকুট। গহনা যতোটা না হলে নয় ততোটা পরেছেন। আজ তার সাজতে ভালো লাগছিল না। মোহিনী নয়, যোগিনীবেশ ধারণ করতে ইচ্ছে করছিল। উথাল-পাথাল চিন্তা গ্রাস করছে তাকে। যা করছেন, অবিমৃষ্যকারিতা নয় তো? এতোদিন নিজেকে সংযত রেখে হঠাৎ দুম করে বিয়েতে রাজি হয়ে গেলেন। একটা অজানা আশঙ্কায় তার বুক দুরু দুরু করছে। আজ আনন্দের দিন, কিন্তু আনন্দের ঘর যে খিলবন্ধ। সবাই মনমরা হয়ে আছেন, কারো মুখেই হাসি নেই। এ যেন বিয়ে নয়, শোকপালন হচ্ছে।

সাড়ে সাতটা বাজতে বিয়ে শুরু হল। বর কনে পিঁড়িতে বসলেন। মন্ত্রপাঠ শেষ হল। বরকে পিঁড়িতে তুলে ধরে তাঁর চারপাশে কনেকে সাতবার ঘোরানো হল। আঙ্গুলের মুদ্রায় বরের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করলেন কনে। এবার শুভদৃষ্টি তারপর মালা-বদল। শুভদৃষ্টি হবার পর কর্ণ কর্তার কানে কানে কী যেন বললেন কলাবতী। কর্ণ কর্তা সবার উদ্দেশে বললেন, কলাবতীর ইচ্ছে মালা উনি কিশোরীলালের কণ্ঠে পরাবেন। তাই হল, কিশোরীলালের গলায় মালা পরাবার পর বিয়ের সমাপ্তি।

কিশোরীলালের প্রসাদ খেয়ে সবাই বিদায় নেওয়ার পর কর্ণ কর্তা, নক্ষত্র ও কলাবতী একটি ফুল দিয়ে সাজানো গাড়ীতে কর্ণ কর্তার বাড়ি গেলেন। ওখানেই বাসরঘর হবে এবং শেষ রাত্রে জামাই পালিয়ে যাবে। এটাই নিয়ম। সবাই মিলে জামাইকে খুঁজে বের করতে হবে। কালরাত্রির পরদিন শুভরাত্রি। পালানো বরকে খুঁজে বের করার

পর সেদিন বৌয়ের মুখ দেখতে দেওয়া হবে।

বাসরঘরে খেলাধুলো ঠিক জমলো না। কর্ণ কর্তার ছোট শ্যালিকা মীনা এবং বারীন দেববর্মন খুব ভালো গান গায়। গান গেয়ে তারা আসর মাতিয়ে রাখলো। নিজেরাও ঘুমলো না, অন্যদেরও ঘুমোতে দিল না। নক্ষত্র ঘুমোবার ইঙ্গিত দুয়েকবার দিয়ে উশখুশ করছিলেন। কেউ ইঙ্গিতের মর্মই বোঝে না। মাথা মোটা। মনে মনে গালি দেন নক্ষত্র।

বিয়ের পর একমাস নক্ষত্র, বলতে গেলে ঘর থেকেই বেরোন নি। সারাক্ষণই কলাবতীকে জড়িয়ে মাতঙ্গ-মাতাল উদ্দাম প্রেমে ভেসে যেতে চাইছেন। শরীরের শেষ নির্যাসটুকুও চুষে খেতে চান নক্ষত্র। কলাবতীর ইচ্ছে-অনিচ্ছের ধার ধারেন না। কলাবতীর ক্লান্তিকে কোন আমল দেন না। শুধু বলেন, এতোদিন পর তোমাকে পেয়েছি। কলাবতী নিজের জন্যে সময় ভিক্ষা চান, পান না। নক্ষত্রের কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। ক্লান্ত, হতাশ, বিরক্ত কলাবতী জানেন, সব কিছুরই কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি আছে। একটা জায়গায় এসে সবাইকে থামতে হয়। তাই হল। আস্তে আস্তে উদ্দামতা স্থিতু হল, কথার জোয়ার থেমে গেলো। নক্ষত্রের মদের প্রতি তীব্র স্পৃহা তীব্রতর হল। নক্ষত্র এখন নিয়মিত অফিস যান। বন্ধুদের নিয়ে মেতে থাকেন। শুরু হল বাঁধাধরা জীবন। স্রোতে ভেসে চলা।

সন্ধে হতে না হতেই বন্ধুদের সমাগম বাড়তে থাকে। তাস খেলা শুরু হয়। মদের ফোয়ারা ছোটে। যতো রাত বাড়ে খেলা জমে ওঠে। জড়িত অসংলগ্ন কথাবার্তা কলাবতীর বিরক্তি উৎপাদন করে।

সেদিনও বন্ধুরা এলে কলাবতী অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি রাখেন নি। কিছুক্ষণ সঙ্গ দেন। আলাপচারিতার পর অন্যদিনের মতো 'কাজ আছে' বলে যাবার উদ্যোগ করতেই কর্ণেল পি. দত্ত আহত স্বরে বললেন, রানীসাহেবা আমাদের মানুষ বলেই গণ্য করেন না।

কলাবতী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, এ কি কথা মিঃ দত্ত? আমি কি এমন কোন ব্যবহার করেছি যাতে আপনারা আঘাত পেতে পারেন?

কর্ণেল দত্ত আমতা আমতা করেন।

নক্ষত্র এবার খোসামোদ করেন, আমাদের সঙ্গে একটু বসলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? সবাই তোমার সঙ্গ পেতে চায়। প্লিজ একটু বসো।

কলাবতী কথা রাখেন। সবাই যখন খেলায় মত্ত, কোনদিকে হুঁশ নেই, নিঃশব্দে কলাবতী উঠে চলে যান। ওদের নজরেও পড়ে না। ওরা তখন নিজেদের তাস একটু একটু খোলতাই করে দেখতে ব্যস্ত। মদের পেয়ালায় চুমুক দিতে ব্যস্ত।

কলাবতী স্টুডিও-তে এসে দরজা বন্ধ করেন। শব্দের গতিকে রুদ্ধ করে একটা টুলে বসেন। সৃষ্টির জগৎ তাকে ডাকছে। মনকে একাগ্র করেন, ভাবনাকে লাগামছাড়া, বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ইজেলে রাখা অসমাপ্ত তিনটি ছবির দিকে। আঁকতে গিয়ে ভাবাবেগে এমন আপ্লুত হয়ে পড়ছেন যে হাতে তুলি অনড় হয়ে থাকে।

প্রথম ছবি— অনেকদিন বাদে কৃষ্ণ এসেছেন বৃন্দাবনে। রাধা কৃষ্ণের দিকে তাকাতে পারছেন না। চোখ নত করে আছেন।

সখীরা বললো, ওমা একি! যার জন্যে এতো হা-পিত্যেশ সেই কৃষ্ণ তোমার সামনে। নয়ন মেলে দেখো।

রাধা বললেন, কি করে দেখবো বলো? আমার তো মাত্র দুটি নয়ন তাও আবার কালাঞ্জনে আবৃত। বর্ষণধারায় আনন্দাশ্রু বইছে। আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সখি!

রাধার অভিব্যক্তি তুলে ধরতে গিয়ে কলাবতী নিজেই চোখের জলে অন্ধকার দেখেন।

দ্বিতীয় ছবি— রাধা কৃষ্ণের ছবি আঁকছেন। ছবি অসমাপ্ত। রাধা কৃষ্ণের পায়ের পাতা আঁকলেন না।

সখীরা বললো, কই পায়ের পাতা আঁকো, নূপুর পরাও?

রাধা আকুল হয়ে বললেন, পায়ের পাতা আঁকলে কৃষ্ণ যদি পালিয়ে যায়?

কলাবতীও পায়ের পাতা আঁকেন নি। শুধু নূপুর এঁকে পায়ের পাতার ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। কৃষ্ণের অঙ্গে পালাবার ভঙ্গি। মুখে চোখে চতুরালি।

তৃতীয় ছবি— রাধা কৃষ্ণের জঙঘা আঁকতে গিয়ে কামজ্বরে অতিষ্ঠ হয়ে ভূমিতে কম্পমান।

এ ছবিতে শুধু দাগ কাটা হয়েছে। অন্য দুটি ছবি প্রায় সমাপ্ত। আজ এ ছবিটিই আঁকবেন বলে স্থির করলেন।

প্রথমে রাধার বেশভূষা নিয়ে ভাবলেন। ঘাগবা চোলি পরাবেন, না শাড়ি? দরজা খুলে কলাবতী ড্রেসিং-রুমে চলে গেলেন। গয়নার বাক্স, ঘাগরা, চোলি এবং জর্জেটের একটা ফিনফিনে পাতলা সাদা শাড়ি নিয়ে স্টুডিও-তে ফিরে এলেন। কলাবতী এবার রাধা সাজবেন। দেয়ালময় আয়নার সামনে দাঁড়ালেন কলাবতী। নিজের বসন খুলে

ফেলে ঘাগরা চোলি পরলেন। সামান্য গয়না পরে লম্বা চুল খুলে পিঠের ওপর এলিয়ে দিলেন। না, এই আবৃত পোষাকে কামজ্বরের রূপ দেয়া অসম্ভব। চোলির ওপরের দিকের দুটো ফিতে খুলে দিলেন। বুকের অর্দ্ধাংশ ফেটে বেরিয়ে এলো। বিচ্ছিরি মনে হল কলাবতীর। ইচ্ছেকৃতভাবে কেউ কামজ্বর প্রকাশ করতে চোলির ওপরের দিক খুলে দেয় না। রাধার ক্ষেত্রে এ স্বাভাবিক নয়। তাছাড়া উন্নত স্তন, নিম্ন নাভি, চিকন কোমর, সুগড়ন পায়ের সৌন্দর্য ধরা দেবে না ঘাগরা চোলিতে। অতএব, শাড়ির আশ্রয় নেয়াই শ্রেয়। সব খুলে ফেললেন কলাবতী। গয়নাও। নিজের নগ্নরূপ আয়নায় দেখে আচম্বিতে তার মুখ ফুটে বেরিয়ে এলো, বাহ্! মেদহীন টানটান তলপেট, নাভিতে হীরে জ্বলজ্বল করছে, পীবর স্তনদ্বয় শিখরের মত উন্নত। টনটন করছে। স্তনের বোঁটা শক্ত হয়ে শিরশির করছে। কদলী বৃক্ষের মত জঙঘা সরু হয়ে সুগঠিত পায়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। নিজেকে দেখে নিজেই লজ্জা পেলেন কলাবতী। বুকের লালিমা তার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে। কলাবতীর মনে হল তারও কামজ্বর হয়েছে। তলপেটে এক অসহ্য অনুভূতি। ফিনফিনে শাড়িটা কোমরে জড়িয়ে উদোম বুকের খাঁজ দিয়ে আঁচল পিঠে চালান করে দিলেন। স্বচ্ছ শাড়িতে প্রতিটি অঙ্গে কামনার জোয়ার নেমেছে। দেখা যায়, আবার যায় না। আলো-ছায়া খেলা করছে। কলাবতীর মনে পড়লো মহারাসের দিনের কথা। সেদিনও নক্ষত্রের স্পর্শে কামজ্বরে বিবশ হয়েছিলেন। তার সেই মাটিতে পা আটকে যাওয়া, আত্মসমর্পণের বিহ্বল ভঙ্গিমা, চোখে মুখের কামদহনকে ছবিতে রূপ দিতে হবে। কাম সম্ভোগে রূপান্তরিত হতে পারে নি বলে অতৃপ্তির আর্তি, যন্ত্রণার অভিব্যক্তি রাধার শরীরে, মুখে-চোখে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এইসব ভাবনায় কলাবতীর শরীরও উদ্দীপিত হয়ে কামজ্বরে আক্রান্ত হল।

নক্ষত্র এখন মদে চুর, তাসে মগ্ন।

কলাবতীর অবস্থা বোঝার ক্ষমতা নেই।

চিন্তার রাশ ধরেন কলাবতী। আয়নায় কামদহনে পুড়ে যাওয়া নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে রাধার কামজ্বরের বাস্তব রূপ দিতে তুলির আঁচড় সমানে টানতে থাকেন। এ ছবি আজই শেষ করতে হবে নতুবা কোনদিনই শেষ হবে না। শরীরের প্রতিটি খাঁজে খাঁজে কামনায় রসসিক্ত রাধার কামজ্বর অবলীলায় রূপ পাচ্ছে দেখে তৃপ্ত হলেন কলাবতী। আশ্চর্য! ছবিটা শেষ হতেই কলাবতীর কামজ্বর সেরে গেল। বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছেন কলাবতী। এ কি রাধা না কিশোরীলালের কলাবতী! কামের এমন রূপ খাজুরাহোর মন্দিরেও দেখেন নি। সঙ্গমরত মূর্তি আছে, কামতাড়িত দেহাবয়ব আছে কিন্তু রাধার কামমোহিত ভাব যেমন প্রকাশ পেয়েছে এ ছবিতে তেমনটি চোখে

পড়ে নি। ভূলুণ্ঠিতা রাধার শরীর কৃষ্ণময় হয়ে গেছে। 'হা কৃষ্ণ' বলে রাধা কল্পিত কৃষ্ণের জঙ্ঘার দিকে দুটো আকুল হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। স্তনযুগল মৃত্তিকার ঘর্ষণেও পাথরের মতো শক্ত। শাড়ি শরীরের কোথাও আছে কোথাও নেই। আলুথালু কেশরাশি। রাধার চোখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। কামতাড়িত আগুন, চোখের আর্তি এত বাস্তব রূপে ধরা দেবে কলাবতী নিজেও ভাবেন নি। অসীম তৃপ্তিতে মন ভরে গেল। তার দুঃখ, বেদনা, কামনা, মান-অভিমান, অনুযোগ সব লোপ পেয়ে গেছে। আনন্দ! আনন্দ! সৃষ্টির আনন্দে কলাবতী আত্মহারা হয়ে গেলেন। এত আনন্দ কোথায় লুকিয়ে থাকে, ধরা দেয় না। সারা শরীর জুড়ে বৃষ্টির মতো আনন্দধারা বইছে। কলাবতী এবার গান ধরেন— 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে/ দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে।' গাইতে গাইতে নাচতে থাকেন কলাবতী। নাচতে গিয়ে টের পান শরীরের অর্দ্ধাংশ জন্মের পোষাক পরে নাচছে। আঁচল মেঝেতে লুটোপুটি। কলাবতী এবার কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে নেমে আসেন। কত রাত হয়েছে কে জানে? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন রাত দুটো। ড্রয়িং-রুম থেকে এখনো হৈ হুল্লোড়ের মৃদু আওয়াজ বন্ধ দরজা ভেদ করে আসছে। সম্বিত ফিরে পেয়ে কলাবতী শাড়ি, ব্লাউজ পরে ভদ্রস্থ হলেন। প্রায় সাতঘন্টা তিনি স্টুডিওতে ছিলেন অথচ সময় কি করে কেটে গেল টেরই পেলেন না। এতক্ষণ একটা তীব্র ঘোরের মধ্যে ছিলেন। বাস্তবে ফিরে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এই শৈল্পিক-সত্তার মৃত্যু নেই। আনন্দেই তার জন্ম, আনন্দেই বসতি। কলাবতী ঠিক করলেন, ছবিটির নাম দেবেন 'প্রথম রিপু'।

নক্ষত্রের পৃথিবী নিয়ে তার আর কোন অনুযোগ নেই। নক্ষত্র যাতে আনন্দ পায়, তাই নিয়ে থাকুক। ছবিটি আঁকার পর যে আনন্দের অনুরণন অনুভূতির শিরদাঁড়া ভেদ করে তার শিরা উপশিরায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাকেই লালিত পালিত করে চিরানন্দে উপনীত হতে হবে। আনন্দের উৎস জানা গেছে এখন কেবল তপস্যা, তপস্যা......

এ সময় কলাবতী তার ডায়েরীতে লিখেছিলেন—

আমাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়ে গেছে, তবুও জীবন ডুবেও ডোবে না। মানুষের প্রাণ এমনি কঠিন তার তুলনা নেই। লোহা গলতে দেখেছি, আগুন ভস্মসার হয়, অগাধ জল শোষিত হয়, পাহাড় ধসে পড়ে, প্রাণের বিনাশ কিছুতেই হয় না। এর বিরাম বিশ্রাম নেই, এর শেষ কোথায়? সর্বস্ব হারিয়ে খেলা ফুরিয়ে গেলেও ক্লান্তি আসে না কেন? খুঁজি মাটির সংসারে আমার সেই ঘর, বালুকণায় খুঁজি এক ফোঁটা জল........ পেলাম না, জলের জন্য মনটা ছটফট করলো। আমি যে জলচর সমুদ্রযাত্রী,

জল ছাড়া বাঁচি কী করে! জল যে জীবন, আমার জন্যে জীবন কোথায়? তবু প্রাণ থাকে, আমি যে অফুরন্ত দুঃখের আগুনে অশেষ হয়ে আছি।

তবুও সেই মধুর দিনগুলো আমার কুঞ্জে গান গায়, সুন্দর কাহিনী রচনা করে, লোকালয় স্থাপন করে, নবজন্ম দেয়। প্রার্থিত সুন্দরকে আমি দেখতে পাচ্ছি। একটা আলোকবিন্দুর রূপময় প্রকাশে বাঞ্ছিত পথরেখা দেখতে পাচ্ছি। স্মৃতিতে যা সুখকর তা নিয়েই আমি সমর্পিতপ্রাণ। নক্ষত্র ওখানে বেঁচে থাকুক।

অনেকে প্রশংসা করেন, পছন্দ করেন কিন্তু আমাকে ভালোবাসতে পারেন না। বুঝেছি, এর পেছনে কারণ ছিল, প্রচারও ছিল। নিতান্তই যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁরা কাঁদলেন, আমার সঞ্চয়ের পাত্রে তাঁরা চোখের জল রেখে গেলেন। ওঁদের বন্ধন ছিন্ন করার সাধ্য আমার নেই। ক্রমাগত স্রোতে-ভাসা মানুষ আমি, আমার ঘুম আসে না। সৃষ্টির আনন্দ আমাকে ঘুমোতে দেয় না। আমি জেগে থাকি।

সেক্সপীয়রের কবিতা মনে পড়ে—

Sigh no more, ladies sigh no more
Men were deceivers ever;
One foot in sea and one on shore,
To one thing constant never

আবার এও তো সত্য! টেনিশন বলেছেন—

'Tis better to have loved and lost than never to have loved at all.

আকাশে নক্ষত্রপতন অনেক বার দেখেছি। যে নক্ষত্রের পতন ঘটে, সে আর আকাশে ফেরে না। চিরতরে হারিয়ে যায়। ঘুমিয়ে পড়ে। আমার স্বপ্নের নক্ষত্র চিরতরে হারিয়ে গেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি জেগে আছি......... জেগে আছি দূরাগত ধ্বনির আশায়। আমি জেগে আছি.........